বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ পত্রিকা

১৯৬৯—৭০-৭১

প্রধান সম্পাদক

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর

ছাত্র সম্পাদকদ্বয়

অমরনাথ দত্ত (১৯৬৯-৭০)

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৭০-৭১)

৩৯, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের পক্ষে অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত এবং কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ ২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্লক মুদ্রণে—রিপ্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট; বিধান সরণী।

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা জিতেন্দ্রনাথ রায়,
তৃতীয় বর্ষ, কলা-বিভাগ।

বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ পত্রিকা

"সম্পাদক মণ্ডলী"

১৯৬৯—৭০-৭১

—

১। অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর।
(প্রধান পত্রিকা সম্পাদক)

কমলাপ্রসাদ ঘোষ।

দীপন চট্টোপাধ্যায়।

নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী।

রঘুনন্দন মিশ্র।

সুশীল রঞ্জন কর্মকার।

„ দুর্গাশরণ চক্রবর্তী।

ছাত্র সম্পাদকদ্বয়

অমরনাথ দত্ত (৬৯-৭০)

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র পাল (৭০-৭১)

Foreword

I deeply regret the considerable delay in bringing out the College Magazine for the sessions 1969—70, 1970—71 under one cover. The political situation, obtaining in the state, was primarily responsible for non-publication of the College Magazine in the aforesaid years.

Be that as it may, the event of the years under review was memorable. The president of our College Governing Body, Sri Prasanta Bihari Mukharji, Bar-at-Law. continued in his exalted office as the head of the Judiciary in the State of West Bnegal and made a name for himself as one of the most erudite, capable and humane Judges of the Calcutta High Court.

Both in the fields of scholastic endeavour and sports and games the students of the years concerned won fresh laurels Our College Athletic team lifted the Coveted Athletic Championship Trophy in the Inter-Collegiate Athletic meet in the successive years under review. The College authorities warmly congratulated the students for the honour they brought to themselves and to the august institution.

In concluding, I want to point out to our beloved students that West Bengal or for that matter, the whole of India is passing through very difficult times. The country is plagued by many ills, political, social, economic and cultural. To meet the challenge of the times may I appeal to my students past or present to imbibe the lofty idealism, burning patriotism, the undaunted courage and the spirit of self-sacrifice of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar—the illustrious founder of the Institution and to rededicate themeselves to the service of the motherland. Long live Vidyasagar of hallowed memory.

Sukumar Chaudhuri
Principal.

॥ আমাদের কথা ॥

সুধীবৃন্দ,

দেশের ঘোরতর আশাহীন অবস্থা ও বিভিন্ন সংকট সম্মুখে উপস্থিত থাকায় ১৯৬৯-৭০-৭১ সালে কোন পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য আমরা পাঠকদের নিকট হইতে মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

বর্তমানে আমাদের এই জগৎ বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটময় জীবনের পথে। অনেক কিছু উৎসাহ ও উদ্দীপনা ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। ঠিক সেই সময়ে ছাত্রগণকে নূতন করিয়া জাগাইবার জন্য এই পত্রিকা প্রকাশিত হইল। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রগণের একান্ত সহযোগিতায় ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে।

আমরা এই বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের ১৯৬৯-৭১ সাল পর্যন্ত পত্রিকার সম্পাদনের সঙ্গে নিযুক্ত ছিলাম। যে সময়ে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম পশ্চিম বাঙলা তখন প্রচণ্ড কুহকটিকার সম্মুখে। বিদেশী আক্রমণের কথা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে পশ্চিম বাঙলায় আগে কখন এমন নিপীড়িত, সংকটের দিন আসে নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একান্ত ইচ্ছায় যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আমাদের সেই কলেজের ছাত্রহিসাবে প্রতিষ্ঠাতার সৎ, সত্যবাদী, সরল ও নিষ্ঠাবান আদর্শের অনুগামী হইতেই হইবে। কর্মময় জীবনের মধ্য দিয়া সেই আদর্শকে সত্যিকারের বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। এবং বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের মহান কীর্তিকে চিরকালের মতন বজায় রাখিতে হইবে। আমাদের মনে হয় ছাত্রগণ ইহাকে নিজেদের দৃঢ় কর্তব্য হিসাবে পালন করিবে। "জয়হিন্দ"।

বিনীত—
পত্রিকা-সম্পাদকদ্বয়
অমরনাথ দত্ত
ব্রজেন্দ্র পাল

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	প্রবন্ধ		
	কৃত্তিবাসি রামায়ণের সাহিত্যিক সৌন্দর্য (অনুক্রমণ)	— অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর	
২।	শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান	— অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায়	
৩।	ভাইরাস	— অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র	
৪।	আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে বাঙ্গালী জীবনের প্রভাব	— শৈলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
৫।	নাটকের চোখে শতাব্দীর দর্শক	— রঞ্জন কুমার রায়	
৬।	জীবন ও সাহিত্য	— শিবপ্রসাদ মিত্র	
৭।	সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতি সমীক্ষা	— তারক কুমার দে	
৮।	স্বামী বিবেকানন্দ	— রামচন্দ্র মাইতি	
৯।	মানুষ চুনিল যবে নিজ মর্তসীমা	— বিমান কুমার রায়চৌধুরী	
১০।	বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষ—ভারতবাসীর কি চিরস্থায়ী বন্ধু	— শ্যামলেন্দু হালদার	
১১।	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সংকলন)	— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
	সম্পাদকীয়		
	ক্রীড়া-পত্র	— উৎপল কুমার সেন	
	Editorial	— Prof. Dhirananda Tagore	
	ক্রীড়াবিষয়ক		
১।	ভারতীয় ক্রীড়ামান নিম্নাভিমুখী কেন	— অজিত কুমার রায়	
২।	ভারতীয় ফুটবল : মারডেকা সমীক্ষা	— আদিনাথ ঘোষ	
৩।	ভারতের 'ববার' বিজয়	— শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য	
	গল্প		
১।	প্রতিদান	— পরেশ সাহা	
২।	অপর নাম জীবন	— কৈলাস চন্দ্র মল্লিক	
৩।	বৃত্ত	— বিমলেন্দু ভট্টাচার্য	
৪।	একটি 'ভাল-লাগা'র মৃত্যু	— উৎপল কুমার সেন	

কবিতা

	স্বপ্নের দিঁড়িতে	— অধ্যাপক সমীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৭৭
২।	অভ্যুদয়	— শিবপ্রসাদ মিত্র	৭৮
৩।	নব জাগৃতির কবি	— অলোক কুমার রায়	৭৯
৪।	কোন এক বিস্মৃত মুহূর্ত	— প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়	৮১
৫।	স্বপ্ন শেষে	— স্বপন কুমার রায়	৮২
৬।	নির্ভীক বাঙ্গালী	— দিলীপ কুমার মাজী	৮৩
৭।	আজকের বাংলাদেশ	— অমলচন্দ্র দাস	৮৪
৮।	এবং অবশেষে	— মৃত্যুঞ্জয় নন্দী	৮৫
৯।	দুর্দিন	— তপন কুমার পাল	৮৭
১০।	আহ্বান	— রাজেন্দ্রলাল ঘোষ	৮৯
১১।	জয় বাংলা	— তপন পাল	৯১
১২।	মুক্তির আহ্বান	— জগদীশ বসাক	৯২
১৩।	'কলকাতা/৭০'	— উৎপল কুমার সেন	১৩৫

English

The early human environment of Rabindranath — Prof. Dhirananda Tagore

2. Electron Diffrction Phenomenon And Its Applications — Prof. Harraprasad Mitra
3. Byrenic Impact on Heathcliff In "Wuthering Heights" — Prof. Anupam Kumar Mukherjee
4. The Contrast — Prof. Dipan Chattopadhyaya
5. You and I — Shantonoo Ganguly
6. Deep craze for resemblances — Shantonoo Ganguly

हिन्दी

1.	अनुशासन और शिष्टाचार	— नन्दलाल मोहता बीकहम	125
2.	राजभाषा की ग्रमाह्यता	— शिवप्रसाद पाठक "विशारद"	127
3.	अमेरिका पाकिस्तान के मध्य बंगला देश	— शिवप्रसाद पाठक, कलाविभाग	129
4.	मेरी प्रिय	— भैरवलाल शर्मा	131
5.	समय का सदुपयोग	— घनश्याम दास अग्रवाल	132

চিত্র-পরিচিতি

১।	সন্তরণ প্রতিযোগী	—
২।	এন্, সি, সি,	—
৩।	ছাত্র-সংসদ	—
৪।	বেণুকুঞ্জে (অঙ্কন)	— জিতেন্দ্র নাথ রায়

কৃত্তিবাসি রামায়ণের সাহিত্যিক সৌন্দর্য

(অনুক্রমণ)

অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর

অযোধ্যা-কাণ্ড

(৩)

রামায়ণে আগাগোড়া দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ পরপর বর্ণিত হোয়েছে।

রাবণ-অত্যাচারিত দেবতাদের দুঃখ, সেই দুঃখ থেকে দেবগণকে ত্রাণের জন্যে বিষ্ণুর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন-রূপে অবতারের আশ্বাস-সুখ, মহারাজ দশরথের অপুত্রকতার দুঃখ, তারপর রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের জন্মে দশরথের অপরিমেয় সুখ, আবার তাঁর পুত্র-বিচ্ছেদ-দুঃখ, তাদের পরিণয়ান্তর প্রত্যাবর্তনে সুখ। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান-সমারোহে বুঝি সে-সুখের পরিণতির সম্ভাবনা। কিন্তু তার মূলে অকস্মাৎ হোলো কুঠারাঘাত।

অযোধ্যা-কাণ্ডের দ্বিতীয় অংশে দশরথের সবসুখের আলোকে দুরন্ত লোভের কোড়ো হাওয়া এক ফুৎকারে দিলে নিবিয়ে। নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন হোলো রাজপুরী, সমস্ত অযোধ্যা-নগরী। যে-আশংকার কালো-করাল ছায়া উঁকি দিয়েছিলো দশরথের মনে তাই এমন মর্মান্তিক ভাবে সত্য হোয়ে দেখা দিলো।

দুঃখ-সুখের এই পরস্পর উপস্থাপনা কাব্যরসের মাধ্যমেই পরিবেশিত হোয়েছে। তাতে কোথাও অসংগতি বা অনাবশ্যকতা অনুভূত হয় না, কি কৃত্তিবাসি কি বাল্মীকি-রামায়ণে। তাতে জীবনের বাস্তবিক রূপই ফুটে উঠেছে, একটির পার্শ্ববর্তিতায় অপরটির ভাবদ্যুতি গাঢ়তর হোয়েছে আর ভাববৈচিত্রী রূপবৈচিত্রী বিষয়কে রম্যতর করে তুলেছে।

অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় অংশের, অর্থাৎ মন্থরা-মন্ত্রিত কৈকেয়ীর রামকে-বনে-পাঠানোর কথা, কৃত্তিবাসি রামায়ণে ঐ কাণ্ডের গোড়াতেই আভাসিত হোয়েছে।—

দ্বিতীয় অযোধ্যা কাণ্ড শুন সর্ব্বজন।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন॥

তারপর ক্রমেক্রমে ঐ-কথা পল্লবিত হোয়েছে। অবশ্য রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন-পর্বের পরেই।

বাল্মীকীয় রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের গোড়ায় রামের বনগমনের কথা পূর্ববাচিত হয় নি।

রামায়ণ ও মহাভারত—দুটি মহাকাব্যেরই চরিত্র-চিত্রণে দুর্লভ শিল্পকৃতি অনুষ্ঠিত চিত্তেই স্বীকার্য।

রামায়ণ-মহাকাব্যের এক বিস্ময়কর চরিত্র মন্থরা। এ চরিত্র নিঃসন্দেহে খল ও কুটিল, কিন্তু অতি স্পষ্ট ও বাস্তব। অনর্থ ও অনিষ্ট করার জন্যেই যেন এমন চরিত্রের জন্ম। কোন কিছু ভদ্র, সুন্দর, আনন্দী ও মধুর বুঝি এরা দেখতেই পারে না। অঙ্গবিকৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে চলে এদের চিত্তবিকার। অঙ্গবিকারের দুঃখই কি রোষে-অমর্ষে ক্রুর করে তোলে এদের মনকে?

কৃত্তিবাসি রামায়ণে বর্ণিত হোয়েছে—

জন্মিল সে কুঁজী হার নামেতে মন্থরা।

•

তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ভাবরী।
কুটিলা কুরূপা কুঁজী ক্রূরকর্মকারী॥

• • •

আকৃতি-প্রকৃতি কুৎসিত দেখি তার।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী ঘরে থাকে যার॥

এই জন্মে তার এমন দুর্দশা। কিন্তু কৃত্তিবাস বলেছেন—

পূর্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।

তবে কেন যে তার ঐ দুর্দশা ঘটলো সে-কথা খুলে বলেন নি কৃত্তিবাস। তাই, তার তাৎপর্য অনুভূত হয় না। অনুমান করতে পারি, শাপগ্রস্ত হয়ে তার এই দুর্দশা।

বাল্মীকীয় রামায়ণে মন্থরার এই পূর্বপরিচয় নেই। বাল্মীকি তাকে 'কুব্জা' বলেছেন। তবে ঐটুকুই যা। কৃত্তিবাস তার কুঁজকে 'ভরন্ত ভাবরি' বলে উৎপ্রেক্ষিত করে তার আকৃতিকে চিত্রান্বিত করেছেন।

মন্থরার আরও যে-পরিচয় আছে কৃত্তিবাসি রামায়ণে তা এই—

কৈকেয়ীর চেড়ী ভারতের ধাত্রীমাতা।
দশরথ দেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।

বাল্মীকীয় রামায়ণে বলা হোয়েছে যে মন্থরা জাতিদাসী; জন্ম থেকেই সে কৈকেয়ীর সহবাসিনী।—

জাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয্যা ভু সহোষিতা।

তাকে ভারতের 'ধাত্রীমাতা' বলা হয় নি। বাল্মীকি তাকে একাধিকবার বলেছেন 'পাপদর্শিনী'। তিনি 'বাক্যবিশারদা'—বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন তাকে। প্রাসাদে উঠে অযোধ্যা-নগরীর প্রসাধন দেখে মন্থরার বিস্মিত-হওয়ার চিত্রটি বাল্মীকীয় রামায়ণে সুন্দর হোয়ে ফুটে উঠেছে। অল্পকথায় 'চন্দ্রসংকাশ' ও 'কৈলাসশিখরাকার' বলে প্রাসাদের বর্ণনায় সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় মেলে।

আদি-রামায়ণে চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে আর এক চমৎকার কৌশলকলা দেখি রসসৃষ্টিতে। অযোধ্যা-নগরের শোভাসম্ভারোহ দেখে বিস্মিতা মন্থরা অবিদূরে স্থিতা এক হর্ষিতা ধাত্রীকে তার

কারণ শুধোলে। অমনি সেই হর্ষিণী ধাত্রী পরম আমোদ-আহ্লাদে একেবারে যেন ফেটে পড়লো। আহ্লাদে আপ্লুত হোয়ে সে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজনের কথা বলতে লাগলো।

বিদীর্ণবাণা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরমা মুদা!
আচচক্ষেঽথ কুব্জায়ৈ ভূয়শীঃ রাঘবে প্রিয়ম্।

কিন্তু তা শুনেই মন্থরা রোষে জ্বলে উঠলো।—

ধাত্র্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা।

•

সা দুষ্টমানা ক্রোধেন মন্থরা পাপদর্শিনী।

হর্ষিতা ধাত্রীর পার্শ্বেই অমর্ষিতা মন্থরার রূপচিত্রটি যথার্থই উপভোগ্য। কৃত্তিবাসি রামায়ণে এই সৌন্দর্যটুকু মেলে না।

কৃত্তিবাসি রামায়ণে দেখা যাচ্ছে যে 'কুঁজী চেড়ী' মন্থরা অপর চেড়ীর মুখ থেকে রামের যৌবরাজ্য-অভিষেকের কথা শুনে মর্মাহত হোলো—

বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে।

তার পক্ষে, আর তার ধারণায়, কৈকেয়ী ভরতের পক্ষে, এমন-একটা অনর্থকর ঘটনা ঘটতে চলেছে অথচ কৈকেয়ী সে-বিষয়ে অমন অনবহিত, অমন উদাসীন, এই ভেবে মন্থরা দুঃখে-ক্রোধে অধীর হোয়ে—

কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন।

আপন-ঘরে-শয়ানা কৈকেয়ীর কাছে গিয়েই মন্থরা কেটে পড়লো কর্কশ-বচনে—

নির্বুদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছে কোন লাজে।
তোমার ভরত আজি মনোদুখে মজে॥
অপমানে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে॥

কিন্তু এত উৎক্ষিপ্ত ক্রোধের সময়েও তার মুখ্য বক্তব্যের বিষয়টি সে ভোলে নি, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটতে দেয় নি নিজের। তাই কাজের কথা তৎপরতা নিয়েই বলে ফেললে মন্থরা—

ভরতেরে রাজা কর রাখ নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন॥

এই সারকথা বলেই ক্ষান্ত থাকলো না সে। তার বক্তব্যকে একান্ত গ্রাহ্য করে তোলার জন্যে সে তাকে ব্যাখ্যা করে পরিষ্কার করে বোঝাতে লাগলো—

রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত রাজা হইলে সকলি তোমার॥

এতেক রাজার হও তুমি মুখ্যা রাণী।
ভরত হইলে রাজা রাজার জননী॥

রাম রাজা হোলে যে কৈকেয়ী প্রভৃতির ভবিষ্যতে কী দুরবস্থা ঘটবে আর ভরত হোলে কী সৌভাগ্য-সৌধ দেখা দেবে তা উজ্জ্বলভাবে এঁকে ধরলো কৈকেয়ীর মনের সামনে। কৈকেয়ী মানুষটা ভালো, সরল-মনা, বিষয়বুদ্ধিহীন। এই ধারণা ছিলো বুঝি মন্থরার। তাই, বোধহয়, কৈকেয়ীকে বোঝাবার অত সর্বমনা প্রয়াস।

কৈকেয়ী যে আপন স্বভাবে মন্দ নয়, বরং উদারমনা, কুটিল-কুচক্রী, কুব্জদেহা, দুরাত্মমনা মন্থরার কুমন্ত্রণায় পড়েই যে তার সহজে-প্রভাবশীল চরিত্রের বিপথগামিতা—সে-কথা উত্তর কবিই জানাতে চেয়েছেন। কৃত্তিবাসি রামায়ণের মন্থরার প্ররোচন-বচন শুনে প্রথমে অবিচলিত থেকে—

কৈকেয়ী বলেন রাম ধার্ম্মিক তনয়।
কোন্ দোষে রামের করিব অপচয়॥
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়॥
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র পাইতে উচিত॥
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্বজনে।
তুষিবেন রাম সবাকারে বহু ধনে॥

•

রাম রাজা হইলে আমার বহু মান।

কৈকেয়ী শুধু যে প্রথমেই মন্থরার চোপ গিললেন না তাই নয়, তিনি প্রতিযুক্তি-বচন দিয়ে মন্থরাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। রামের গুণপনায় তিনি যে অবহিত ও সুখী তা বেশ বোঝা যায় ঐ উদ্ধৃতি থেকে। অতএব তাঁর সৌমনস্য-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের যে-সংবাদ মন্থরা দিলে তাকে তিনি 'শুভবার্তা' বললেন। তার জন্যে কৈকেয়ী অঙ্গ হোতে অলংকার খুলে মন্থরাকে দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। রাম রাজা হবার পরে আরও ধন দেবার আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু তাতে, সুখী হওয়া দূরে থাকুক,—

কুপিতা মন্থরা চেড়ী দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥

রাগে কাঁপতে-কাঁপতে সে অলংকারগুলো ছুড়ে ফেলে দিলে। তবু তখনও সে তার উদ্দেশ্যের কথা ভোলে নি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে দুঃখ দেখিয়ে কৈকেয়ীর হৃদয় স্পর্শ করার জন্যে বললে—

কৈকেয়ী এত বড় দুঃখ আমার অন্তরে।
বলি হিত বিপরীত বুঝাও আমারে॥

সেখানেও সে থামলো না, কৈকেয়ী ও ভরতের ভবিষ্যৎ দুরবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলে মন্থরা—

থাকিবা দাসীর প্রায় কৌশল্যার আগে॥

•

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই একই শরীর।
উভয়ে করিবে রাজ্য ভরত বাহির॥
তবে ও ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিত কথা বলিলাম বুঝিস অহিত॥
ভরত না পেয়ে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ থাকিবে প্রবাসে॥

আবার মন্থরা তার নিজের মুখ্য কথায় ফিরে এলো—

মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন॥

'যদি লয় মন'—একথায় অনেকগুলো ভাব সূক্ষ্মরূপে জড়িয়ে আছে—চাপা-রাগ, অভিমান ও দুঃখভান। মন্থরার এইসব উক্তি থেকে বোঝা যায়, তার মন কুটিল ও কূটবুদ্ধি হোলেও তা কত নিশাত, কত ভিন্ন।

কৃত্তিবাসি রামায়ণে, দ্বিতীয় প্রয়াসের পর মন্থরার কিছুটা জয় হোলো। কৈকেয়ী প্রায় অভিভূত ও প্রভাবিত হোয়ে পড়লেন, মন্থরার কূটবুদ্ধির সঙ্গে আর যুঝে উঠতে পারলেন না—

শুনিয়া কুব্জীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুব্জীর বচনে তার বুদ্ধি হইল নাশ॥

মন্থরার ধীর-মন্থর, শীতল বুদ্ধির মোহমন্ত্রে সম্মোহিতা হোয়ে কৈকেয়ীর স্বভাব-সুলভ ভদ্রতা ও গুণগ্রাহিতা তখনও একেবারে চাপা পড়ে যায় নি। তাই—

কৈকেয়ী বলেন কুব্জী তুমি হিতৈষিণী।
রাম মম মঙ্গলকারী কিছুই না জানি॥
ভরত প্রবাসে রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি যুক্তি বল কুব্জী॥

তবু এখনও কৈকেয়ীর মন সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব হোতে পারে নি। মনে সংশয় জাগে, মন্থরার মন্ত্রণায় সম্মত হওয়া ঠিক কি না। রামকে বনে পাঠাবার কথা ভাবতে তাঁর কোমল-করুণ মনে বেদনা লাগে। তাই দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে বলেন কৈকেয়ী—

নৃপতির প্রাণ রাম গুণের সাগর।
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর॥
ঘরেতে রাখিব ভরত রাজ্য নাহি দিব।
কোন্ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব॥

রামকে বনে-পাঠানো আর ভরতকে রাজা-করার কোন যুক্তি খুঁজে পান না কৈকেয়ী। মন্থরার প্রস্তাব তাঁকে কি অশান্তিতেই না ফেলেছে। নিঃসহায় বোধ করেন তিনি। তাই মন্থরার কাছে যুক্তি চান।—

যুক্তি বল ভরত কিরূপে রাজ্য পায়।
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।

মন্থরার মনে যুক্তি প্রস্তুতই আছে। উক্তিকে যুক্তি দিয়ে শক্ত করতে সতর্ক তার মন। স্মৃতিশক্তিও তার প্রখর। অনেক পুরোনো কথাই মনে থাকে তার, যা আলাভোলা মানুষেরা মন থেকে হারিয়ে ফেলে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাগুলো মনের আঁচলে গিঁট বেঁধে রেখেছে সে। তাই স্থির আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বললে কৈকেয়ীকে—

পূর্বকথা সকল আমার আছে মনে।

*

তুমি পাসরিলে মোর সব আছে মনে॥

কৈকেয়ীর-সেবায়-মুগ্ধ দশরথের দুটি বর দানের কথা মনে পড়িয়ে দিলে মন্থরা। শুধু তাই নয়। কেমন করে এখন বরদুটি আদায় করে নিতে হবে সে-বুদ্ধিকৌশলও সে শিখিয়ে দিলে।—

পট্টবস্ত্র এড়ি পর মলিন বসন।
খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ॥
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার।
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার॥
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ।
না দিও উত্তর তুমি করিও রোদন॥
বিবিধ প্রকারে তোমা করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমায় বস্ত্র অলংকার নানা॥
তবে পূর্ব্ব বিবরণ কহিবা তাঁর স্থান।
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান॥

লোকচরিত্র-বোধে মন্থরা যে বিশিষ্ট তার কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে তার কৈকেয়ীকে চালিত করার চেষ্টায়। মনের গহনে প্রবেশ করে মনের কথা, অন্তঃস্বভাব বুঝে নেবার মতো অন্তর্দর্শিতা, সূক্ষ্ম অনুধাবন-শক্তি তার বেশ আছে। মহারাজ দশরথ যে কৈকেয়ীর একান্ত বশীভূত

সে-কথা মন্থরা জেনেছে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দিয়েই। এর প্রমাণ কৈকেয়ীকে-বলা তার এই বাক্য—

তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দেয়।
রাম হেন প্রিয় পুত্র বনেতে পাঠায়।
এমনি আসক্ত রাজা তোমার উপর।

তৃতীয় প্রয়াসে মন্থরার হোলো সম্পূর্ণ জয়। কৈকেয়ী আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। মন্থরার বুদ্ধি-যুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি।—

অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ন বদন।
করে ধরি কুব্জীরে করিল আলিঙ্গন॥
কুব্জীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥
যত বল সব-ভাল নহে ত কুৎসিত।
সকলে অহিত মম তুমি মাত্র হিত॥

এখন আর তিনি মন্থরার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াকে অন্যায় বলে মনে করছেন না।—

ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুব্জীর বচনে।
অধর্ম্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে॥

এখন বুঝি তিনি আর সে কৈকেয়ীই নন। মন্থরার বচনেরই প্রতিধ্বনি করে বলতে এখন সংকোচ তো নেই-ই, বরং তাতেই তার স্থিরপ্রতিজ্ঞতা।—

যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন।
তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
বনে পাঠাইব রামে দেখহ এক্ষণে॥

বিরক্তি, উষ্মা, কটুভাষ, ভীষা, দুঃখ, অভিমান, সহানুভূতি, লোভ প্রভৃতি বুদ্ধি-প্রযুক্ত নানা-আয়ুধ-দিয়ে-সজ্জ জয়ে মুক্তশ্বাস, নিশ্চিন্ত আনন্দ বুঝি ভ্রুকুটি-কুটিল আননে বঙ্কিম হাস্যরেখা অঙ্কিত করে দিলে মন্থরার চাপাঠোঁটে।—

কৈকেয়ীর কথা শুনি কুব্জীর উল্লাস।

বাল্মীকীয় রামায়ণে দেখা যায়, মন্থরা-জিজ্ঞাসিত কথার উত্তরে রাত্রী রামের অভিষেকের সংবাদ দিলে মন্থরা অমর্ষিতা হোয়ে প্রাসাদ-শিখর থেকে নেমে এসে সোজা কৈকেয়ীর শয়ন-কক্ষে গিয়ে ঢুকে শয়িতা কৈকেয়ীকে তার সমুপস্থিত বিপদের সম্বন্ধে নিবোধিত ও সঙ্কেতিত করতে সচেষ্ট হোলো।—

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ত্ততে।
উপপ্লুতমহৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে॥

ভৃত্যের কথা শুনে, প্রথমে বুঝতে না পেরে কৈকেয়ী বিষণ্ণ হোয়ে মন্থরাকে কথাটা বলতে বললেন। তখন মন্থরা জানালে—

রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

তারপর কৈকেয়ীকে বুঝিয়ে দিলে যে তার স্বামী দশরথ তাকে প্রতারিত করেছেন। তিনি দ্বৈতমনা, দ্বৈতমুখ। বাইরে মধুর বচনে তিনি অন্তরের ছলনা ঢেকে রেখে তাকে ভোলাতে চান। কৈকেয়ীকে তার পতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার তীব্র প্রয়াস করেছে মন্থরা। এই ভাব কৃত্তিবাসি রামায়ণে দেখা যায় না। সেখানে কৈকেয়ীকে কৌশল্যার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কিঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, দশরথের বিরুদ্ধে নয়।

এখানে দশরথ সম্বন্ধে মন্থরা যে বিষম বিষোদ্গার করেছে তাতে কৈকেয়ীর কোন প্রতিবচন নেই। সে-বিষয়ে তিনি অবহিত হননি, না, অবহিত হোয়েও কোন প্রতিবচন বলেন নি তা বোঝবার উপায় নেই।

কিন্তু মন্থরার সংবাদ-বহনের অবধান আছে কৈকেয়ী-চিত্তে। তার প্রমাণ, তিনি তাতে পরম হর্ষ ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন।—

উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী॥
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা।

তিনি স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবেই তাঁর মনের কথাটা জানিয়ে দিলেন যে রাম আর ভরতকে তিনি সমান দৃষ্টি দিয়েই দেখেন।—

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।

এর চেয়ে শুভসংবাদ, সুখবার্তা তাঁর কাছে আর কিছু হোতে পারে না।—

ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।

অমন করে উৎক্ষিপ্ত করার পরও কৈকেয়ীকে অবিচলিত থাকতে দেখে মন্থরা 'কোপদুঃখসমন্বিতা' হোলো। আবার সে কৈকেয়ীর মহাবিপদের ও অতিশয়িত দুঃখের সম্বন্ধে চেতনা জাগাবার চেষ্টা করলে। পরম শোচনীয় বিপদে কৈকেয়ীকে দুর্বিতা দেখে তার দুর্মতির জন্যে মন্থরা দুঃখ প্রকাশ করলে।—

যদ্ধোচিতবো দ্বষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং বাসনং মহৎ।
শোচামি দুর্মতিত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ।

না। তাতেও কোন ফল হোলো না। শুধু যে চেষ্টা বিফল হোলো তাই নয়। কৈকেয়ী তাঁর রাম-সম্বন্ধীয় ধারণা ধরেই থাকলেন, বরং তা মন্থরার মনে ধরাবার জন্যে তিনি রামের গুণাবলি সুখ্যাতি করতে লাগলেন।—

রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকেয়ী প্রশশংস হ।

তার ওপর, রামেরই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার ন্যায্যতার যুক্তি দিলেন।—

রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি ॥

রামের কর্তব্য-বোধ সম্বন্ধে কৈকেয়ী নিঃসংশয়। নিজের মায়ের চেয়ে রাম তাঁকে অধিক শুশ্রূষা করে।—

কৌশল্যাতোঽতিরিক্তং চ মম শুশ্রূষতে বহু ॥

কৈকেয়ীর এই বিপরীত-মতিত্ব দেখে মন্থরা মর্মাহত হোলো। কিন্তু তবু সে হাল ছেড়ে দেয় নি। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার তাকে বোঝাতে লাগলো, রাম রাজা হোলে ভবিষ্যতে তার ও ভরতের কী দুর্দশা-দুরবস্থা ঘটবে। তাই, সে আবার ভরতকে রাজা দেয়ার এবং রামকে 'বিবাসে' দেবার কথা মনে করিয়ে দিলে।

এইবার আর কৈকেয়ী স্থির থাকতে পারলেন না। বাক্যবিশারদা মন্থরার বচনকলায় অনুভাবিত হোয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—

অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়ামাহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমদ্যাভিষেচয়ে ॥

এখন কী উপায়ে এই কাজদুটি সাধিত হবে তার উপায় উদ্‌ভাবন করতে বললেন মন্থরাকে। মন্থরা তার কথা বলতে চাইলে কৈকেয়ী পরম উৎসাহ সহকারে তা শোনার জন্যে আগ্রহী হোলেন। অল্পকথায় তাঁর এই ভাবটি এক সংকেতময় বাগ্‌বিচিত্রে ফুটে উঠেছে।—

কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ ॥

সেই বরদুটি-চাওয়ার সহজ উপায় তো আছে। কিন্তু কৈকেয়ী কি তার কথা ভুলে গেছে? না, ভোলার ভান করে তার কাছে শুনতে চাইছে?—সংশয় জাগে মন্থরার। তাই তার প্রশ্ন—

কিং ন স্মরসি কৈকেয়ি স্মরন্তী বা নিগূহসে।

এই বলে মহাসুর শম্বরের সঙ্গে সমরে-ক্ষতবিক্ষত দশরথকে সেবা দিয়ে তুষ্ট করে কৈকেয়ীর বরদ্বয়-লাভের কথা সে মনে করিয়ে দিলে। সেই দুটি বরের একটিতে রামের অভিষেকের স্থলে ভরতের অভিষেক, অপরটিতে চোদ্দ-বছরের জন্যে রামের 'প্রব্রাজন' করাবার বুদ্ধি দিলে মন্থরা। চোদ্দ-বছরের প্রব্রাজনের যুক্তি হোলো, এই সময়ে ভরত প্রজাদের প্রীতিভাব অর্জন করে রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
প্রজাভাগবতস্নেহঃ স্থিরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥

• • •

চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
কণ্টকঃ কৃতমূলস্তে নির্যাস্যতি সুতঃ ॥

বরদুটি আদায়-করার কৌশলও মন্থরা কৈকেয়ীকে শিখিয়ে দিলে। এই প্রসঙ্গে কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের আসক্তি ও দৌর্বল্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কৈকেয়ীর প্রয়াসকে উৎসাহিত ও দৃঢ়তর

করার চেষ্টা করলে। সে যে দশরথের মনের পরিচয় জানে তার সেই সূক্ষ্ম অনুভব ও অনুমান-শক্তির পরিচয় বিলক্ষণ মেলে এখানে।

কৈকেয়ী-সম্বন্ধে দশরথের চরিত্র-বিষয়ক মন্থরার অধ্যয়ন ও অবধান এই—

দয়িতা ত্বং সদা ভর্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিষেদপি হুতাশনম্॥
ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ॥
নহ্যতিক্রমিতং শক্যমস্য বাক্যং মহাপতিঃ।

বর চাইলে সরলা কৈকেয়ীকে দশরথ সম্পদ দিয়ে ভুলিয়ে দিতে পারেন, এই অনুমান করে মন্থরা তাকে আগে থেকে সাবধান করে দিলে যেন সে তাতে না ভোলে।—

মণিমুক্তা সুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ।
দত্ত্বাদ্য দশরথো রাজা মা স্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ॥

বর-আদায় করার জন্যে কী-ভাবে কপট ক্রোধ ও অভিমান করে কোপকক্ষে ভূমিতে মলিন বেশে শুয়ে থাকতে হবে, দশরথ কথা কইলেও প্রথমে নিরুত্তর থাকবে কৈকেয়ী—এ-কৌশল মন্থরা শিখিয়ে দিলে—

যা শৈবনং প্রত্যুদীক্ষেথা যা চৈনমভিভাষথাঃ।

মন্থরার চাতুরী-কৌশলের বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হোয়ে কৈকেয়ী ছেলেমানুষের মতো আহ্লাদে উল্লসিত হোয়ে উঠলেন।—

হৃষ্টা প্রতীতা কৈকেয়ী……।
……কিশোরীবোৎপথং গতা॥

বিস্মিত হোয়ে কৈকেয়ী মন্থরার বুদ্ধির প্রশংসা তো করলেনই, তার রূপ যে কুৎসিত নয়, তার কুঁজ সত্ত্বেও যে সমীর-নমিত কমলের মতো দেখায় তাকে, তার মুখখানি যে বিমল চাঁদের মতো, ইত্যাদি কথাও উচ্ছ্বসিত হোয়ে বলতে থাকলেন।—

প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে ভ্রোণীভিধায়িনি॥
পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে।

ত্বং পদ্মমিব বাতেন সংনম্রা প্রিয়দর্শনা।

কৈকেয়ীর মন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হোয়ে গেলো। এখনকার কৈকেয়ী যেন আর সে-কৈকেয়ী নন। অবশ্যই তাঁর চিত্তের আর্জবের কারণেই এই সম্ভূতি।

তদা হেমোপমা তত্র কুব্জাবাক্যবশংগতা।

যে-কৈকেয়ী রামের অভিষেক-সংবাদ শুনে অত আনন্দিত হোয়েছিলেন, রামের গুণের কথা

বলতে হোয়েছিলেন উৎসাহিনী তিনিই এখন বলছেন রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোলে তাঁর জীবনান্ত হবে।—

এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥

কৈকেয়ীর উল্লাস-উচ্ছ্বাস দেখে বুঝি মন্থরা ভাবলে যে তাতে কৈকেয়ীর লক্ষ্যতৎপরতা বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হোচ্ছে। তাই, সে তাকে কর্মতৎপর করার জন্যে বারেবারে বাক্যশরে বিদ্ধ করতে লাগলো।—

ততো হি কল্যাণি যতস্ব তৎ তথা
যথা সুতস্তে ভরতোঽভিষেক্ষ্যতে ॥
তথাভিবিদ্ধা মহীবীতি কুব্জয়া
সমাহতা বাগিষুভির্মুহুর্মুহুঃ।

মন্থরার ওষুধ ঠিক ধরেছে। তার কথায় কৈকেয়ী উচ্ছ্বাস বিরত করেছেন। এখন তিনি সংকল্প করছেন যে রাম বনে না-যাওয়া পর্যন্ত শয়ন, ভূষণ, প্রসাধন, পান, ভোজন কিছুই গ্রহণ করবেন না। এমন-কি, বেঁচে থাকতেও তাঁর ইচ্ছা থাকবে না।—

অহং হি নৈবান্তরণানি ন স্রজো
ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবনং
ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্ ॥

এই সুদারুণ বচন বলে মালা-ভূষণ খুলে ফেলে কৈকেয়ী মলিনমুখ হোয়ে ভূমিতে শয়ন করলেন। মহাকবি চমৎকার একটি উপমা দিয়ে তাঁর এই অবস্থাটি বর্ণিত করেছেন। এখন তাঁকে দেখাচ্ছে তমসাচ্ছন্ন তারকার মতো।—

তমোবৃতা দ্যৌরিব মন্দতারকা ॥

—বাল্মীকীয় ও কৃত্তিবাসীয় রামায়ণে বিবৃত মন্থরা-কৈকেয়ী সংবাদ সংক্ষেপে উপস্থাপিত হোলো। এ থেকে দেখা যাবে যে আদি কবির বিবরণই মোটমাট অনুসরণ করেছেন কৃত্তিবাস। মন্থরা ও কৈকেয়ীর চরিত্র-চিত্রণে ও বিষয়ের বর্ণনে তিনি বাল্মীকির অনুবর্তন করলেও আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটি মনে নিয়ে আপন মনে তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু, বাল্মীকীয় রামায়ণে ঐ চরিত্র-দুটির চিত্রণে অধিকতর সূক্ষ্মতা ও সজীবতা অনুভূত হয়। আর যেহেতু চরিত্রদ্বয়ের সৃষ্টিতে বাল্মীকিরই মৌলিকতা তাই তাঁর কৃতিত্বই বিশেষ-ভাবে সুখ্যাপনীয়। বাস্তবিক জীবনের, কুটিল-ক্রূর চরিত্র-নির্মাণে বাল্মীকি যে-প্রতিভা দেখিয়েছেন তা দুর্লভ।

বিধাতার মন্থরা-সৃষ্টির কারণের কথা কৃত্তিবাস একটু ব্যাখ্যান করে বলেছেন।—

রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান।
রাজার মরণ কৈকেয়ীর অপমান ॥

মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥

বাল্মীকীয় রামায়ণে এই ব্যাখ্যান নেই। কৃত্তিবাস এই ব্যাখ্যান দিয়ে, বোধহয়, পাঠক বা শ্রোতার মনে মন্থরা-চরিত্রের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। রাবণকে বধ করে উৎপীড়িতের দুঃখভার হরণ করা মহাবিষ্ণুর রামরূপে অবতরণের অন্যতম মুখ্য কারণ। রাবণ-বধের একটা প্রত্যক্ষ হেতু হোতে হয়। সীতাহরণ সেই হেতু। রাম বনে না গেলে সীতাও যেতেন না। তাই তার হরণেরও কারণ ঘটতো না। মন্থরা না থাকলে দেখা দিতো না রামের বনগমনের কারণ। দশরথের কৈকেয়ীকে বর-দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও না। কারণ, কৈকেয়ী নিজে তাকে এই উদ্দেশ্যের কাজে লাগাবার কথা ভাবতে পারেন নি। মন্থরাই তাঁকে এ-বিষয়ে প্রবৃদ্ধ করেছিলো।

কৃত্তিবাস আর-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তা হোলো কৈকেয়ীর মতিচ্ছন্নতার কারণ-দেখানো। তিনি লিখেছেন—

ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে॥
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণের ছলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে দিল অভিশাপ॥
দেখিয়া করিল ব্যঙ্গ কহিল কর্কশ।
সর্ব্বলোকে গায় যেন তব অপযশ॥
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেকে এ সব ঘটন॥

এই ঘটনার অবতারণায় মন্থরার অপরাধের কিছুটা লাঘব হয়, মনে হয়। শৈশবে বা কৈশোরে কৈকেয়ীর স্বভাবটা যে বেশ ভালো ছিলো না তার অন্তত একটা প্রমাণ পাওয়া গেলো। স্বভাবের দোষে কর্মদোষ। কর্মদোষে অভিশপ্ততা। এ থেকে অনুমান করা যায়, 'শিশুকালে'-পাওয়া কৈকেয়ীর 'ব্রহ্মশাপ' সত্য-হবার জন্যেই মন্থরার হেতু-হওয়া। অবশ্য শৈশবে কৈকেয়ীর এক ব্রাহ্মণকে 'ব্যঙ্গ' করা ও 'কর্কশ' ভাষায় কথা বলার ব্যাপারটাকে অবোধ শিশুর ছেলেমানুষি বলে মনে করতে পারলে ব্রাহ্মণের ধৈর্যচ্যুতি ও অসহিষ্ণুতাই নিন্দনীয় হয়।

স্পষ্টই বোঝা যায়, কৃত্তিবাস এখানে ব্রাহ্মণের গরিমা স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন ব্রাহ্মণকে অপমান করার গর্হণীয়তা দেখিয়ে।

সে যাই হোক, এই ঘটনা বাল্মীকীয় রামায়ণে দেখতে পাই নে।

মন্থরা-কৈকেয়ী-সংবাদে একটি অন্তঃশীল নাটকীয়তা অনুভব্য। চরিত্র-চিত্রণের সজীবতা বাস্তবতা, কৈকেয়ী-চরিত্রে সংশয়-দ্বন্দ্বতা, কৈকেয়ী-মন্থরার দ্বন্দ্ব, সজীব সংলাপ প্রভৃতি এই অংশকে নাটারসে সিক্ত করে রেখেছে। মন্থরা-ঘটিত কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনার ব্যাপারটি মূল আখ্যানে প্রথম মুখ্য কঠোর সংঘাত সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মুখ্য আখ্যানের মোড় ঘুরে গেছে। কথাবস্তু জটিল হোয়ে উঠেছে এর কারণে। পরবর্তী সব ঘটনা এরই হেতুকতায় ঘটার ক্ষেত্র প্রস্তুত হোতে পেরেছে। অতএব বলা যায়, সমগ্র আখ্যানের কেন্দ্রবর্তী এই ঘটনা।

অনন্যসামান্য এক খল-চরিত্র মন্থরা। অল্পকালের জন্যে তার উপস্থিতি হোলেও তারই দৌর্মনস্যের উপস্থিতি পরবর্তী সব কাণ্ড জুড়ে।

সূচনায়, নিষাদের পৈশুন্যে যার আভাস মন্থরার মন্ত্রণায় বুঝি তারই বিভাসনা।

কিন্তু এরই পটভূমিকায় রাম-চরিত্রের ভাস্করতা-বৃদ্ধি।

[অনুক্রমিত

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।

অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায়

শুরু অন্ধকার যখন আমাদের দেখাশোনাকে শান্ত ক'রে দেয় তখনই আমরা এক শব্যাতলে নিখিলকে এবং নিখিলমাতাকে আমাদের বুকের কাছে নিবিড়ভাবে অনুভব করি এবং বলি : ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। অহং যেখানে ভূমা—অহং সেখানেই সর্বব্যাপী। এখানেই সর্বকাম ও সর্বরসে বাক্-রহিত ব্রহ্ম সুস্থিত। রবীন্দ্র-মনন উপনিষদের এই আনন্দময় উদ্ভাসন অনুভব করেন 'কঠ'—২।২।১২ স্মরণে : (১)

"একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"

বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনা এই আদর্শে অবস্থিত নয়। শঙ্কর একদিন বলেছিলেন : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর রামানুজ মন্তব্য করেছিলেন : ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। ব্রহ্মের সত্যতা উভয়েই মেনে নেন। পারমার্থিক জগতের অস্তিত্ব নিয়েই যা কিছু পর্যালোচনা। রাবীন্দ্রিক মনন একক ব্রহ্ম সাধনাই শেষ পর্যন্ত করেন ; বৈষ্ণবিক দ্বৈত-সাধন সর্বাংশে গ্রহণ করেননি। তবে, কয়েকটিক্ষেত্রে ব্রহ্মস্বরূপের প্রাক্ মুহূর্তে চিরন্তন মানবমুখীনতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন বিপুল জিজ্ঞাসায়।

'Religion of Man'-তে (২) রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানেই তিনি বিশেষভাবে বৈষ্ণবিক চিন্তাভাবনার একটি স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল : "Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poets of the Vaishnava sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea deep in the obvious meaning of these poems." তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই কবিরা পরম প্রেমিকের কথা বলেছেন, যাঁর স্পর্শ আমরা অনুভব করি আমাদের সকল প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি প্রেম, পশুর প্রতি, শিশুর প্রতি, সখার প্রতি, দয়িতের প্রতি প্রেমের ভেতর দিয়ে যে প্রেম আমাদের বাস্তবের চেতনাকে আলোকিত করে। তাঁরা এমন এক প্রেমের কথা গেয়েছেন যে প্রেম অসংখ্য বাধাকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়েছে মানুষ ও মানুষের স্বর্গীয় সত্তার ভিতরে। সেই প্রেম এমন শাশ্বত সম্পর্ক স্থাপন করে যার ভেতর উভয়ের পূর্ণতা লাভের জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভর করে এবং যার চরিতার্থতা ঘটে

ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার পরিপূর্ণ মিলনে। এটাই যেন সুখ দুঃখের আলিম্পনে স্মিতরঞ্জিত ছবি।

'নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের ওপর ঢেউ মেলিয়ে। মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।" নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটিতে। পেনেটির বাগানবাড়ির গঙ্গাতীরে ছেলেবেলায় রবীন্দ্র-ভাবতন্ময়তায় বৈষ্ণবীয় কাব্যানুরাগ প্রলম্বিত হয়েছে কবিকল্পনার চঞ্চল অনিশ্চিত আলোক-পাতে।

বৈষ্ণব পদাবলীর মৌল বিষয় পরকীয়া প্রেম—সামাজিক সংঘাতে তা' ক্ষত বিক্ষত। ১৩০৪-এ গ্রাম্য সাহিত্য! আলোচনায় (৩) রবীন্দ্রভাষ্য: 'বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজ বাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।' এমন কি বৈষ্ণব কাব্যাশ্রয়ে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হয়েছে। সে গৌরব সমাজনীতির হিসেবে নয়, সেকথা অনুভববেদ্য। নিছক প্রেমের মানদণ্ডে এর মূল্যায়ন। কাব্যে ক্ষতি নেই—সমাজের অভ্রভেদী কলঙ্ক চূড়ায় স্পন্দিত। পদাবলীর পরশপাথর ছুঁইয়ে কাম রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমে। 'গ্রাম্য সাহিত্য' আলোচনায় তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে বলেছেন যে, "তাঁরা কামকে প্রেমে পরিণত করবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয় বিকার কোথাও স্থান পায়নি তা বলতে পারিনা! কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হয়ে চলেছে।" বৈষ্ণবীয় কাব্য রচনায় উদ্ভূত প্রেম, ইন্দ্রিয়-বিকার ও বিক্ষুব্ধ সামাজিকতার চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন! এজন্য অন্যান্য সৌন্দর্য প্রকাশিত হলেও এই ভাববৃন্দাবনের একটি প্রান্ত আমাদের সমাজের বিক্ষিপ্ত বৃন্দাবনে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন 'সোনার তরী' স্মরণীয় 'বৈষ্ণব কবিতায়' (৪):

"সত্য ক'রে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?"

১৩১৩ খ্রীঃতে শিল্প প্রদর্শনীর এক সাহিত্য আসরে রবীন্দ্র অভিভাষণ 'সাহিত্যে' (৫) উদ্ভাসিত হয়: বৈষ্ণব কাব্যেই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ

আশ্রয় থেকে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বের করে আনল। পর্বতের গুহা ভেদ করে ঝরণা বের হল। শাঙন ঘন রজনীতে জ্ঞানদাসের ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা উদ্বেলিত হয়েছে :

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
ঝিমিঝিমি শবদে বরিষে।"

তারই ছন্দায়িত কাব্যচেতনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"শ্রাবন মেঘে তিমির ঘন শর্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্মরি।
জলদরব- ঝঙ্কারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম ঘুম তন্দ্রাতে
অলস মন শিথিল তনু-বল্লরী!"

১৩৪৫-এর 'শ্যামলী'র 'স্বপ্নে (৬) তার চিত্রলরীতি চিত্রায়িত হয়েছে কবির চিত্রধর্মিতার মাধ্যমে :

শ্রাবনের রাত্রে এমনি করেই ঝরেছে সেদিন
বাদলের হাওয়া
মিল হয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।"

আবার, ১৩৪৬ সালে 'বাংলা ভাষা (৭) বিষয়ে' তুলনামূলক ভাবে কাব্যের গতিশীলতায় 'রজনী শাঙন ঘন' পদটি প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন।

ছোট্ট রবিরশ্মি পরিণত হলো ভানুর দীপ্তিতে। চমক দেবার ইচ্ছায় ১২৮৪তে 'ভারতী'-তে ভানুসিংহঠাকুর সাতটি পদ লিখলেন। কিন্তু জীবনস্মৃতিতে (৮) রবীন্দ্রনাথ—'আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলান চালা সুর নেই, তা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" ২০টি কবিতার সংগ্রহে কবির খণ্ডিত দৃষ্টি প্রতীয়মান হয়। প্রথমপদে বসন্তের আগমনে হর্ষের মাঝেও রাধার বিরহ চিত্রটি স্মরণীয়। তৃতীয় পদে রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় যে রজনী যাপন করেন তার চিত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বৈষ্ণব ভাবনাকেও দ্যোতিত করেনা। ষষ্ঠপদে রাধাকৃষ্ণের মিলন আধুনিক নায়ক নায়িকার মিলনের একটি চিত্রাভাস। সপ্তম পদে রাধার অভিসার ও দশমপদে প্রণয়ের পর একাদশে মিলন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' অল্প বয়স্ক প্রেমেরই প্রতিনিধি বলে গণ্য হয়—তা বৈষ্ণবীয় চিন্তা বা দর্শনকে চিহ্নিত করে না। এর ভাষা অত্যন্ত কৃত্রিম। বৈষ্ণব পদাবলীর মৈথিলী শিল্পরীতিও এখানে প্রতীয়মান হয় না। ব্রজবুলির শিল্পরীতির এবং রবীন্দ্র কাব্যায়নের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন বিদ্যাপতি ঠাকুর ব'লছেন মৈথিলী রীতিতে :

"শুন শুন মাধব কি কহব আন
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান।"

ভানুসিংহঠাকুর কাব্যানুভূতিতে বঙ্গীয় রীতিতে বলেছেন এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'-তে

(৯) বলেন :

"মরমে রহই বসন্ত সমীরণ
মরমে ফুটই ফুল।"

মাথুর ও ভানুসিংহের পদের বিরহ এক নয়। ভানুসিংহ বলছেন :

"চল সখি গৃহে চল, মুছহ নয়ন-জল
চল সখি চল গৃহকাজে।"

নবম পত্রে জয়দেবের 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে'র বার্থ অনুগমন ও চিহ্নিত হয় :

"সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ।"

তিনি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি (১০) প্রবন্ধে বলেছেন : বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন। চণ্ডীদাসের জীবনেও সুখ নাই? বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।" চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রবীন্দ্র-চিন্তাচেতনায় বিপরীত আকর্ষণে প্রলম্বিত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য রবীন্দ্রমননে স্থায়ী আসন পাননি—'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন তিনি সমর্থন করেননি।

১২৮৭তে 'বাল্মিকী প্রতিভার' (১১) বর্ষাভিসার অনুগমনে লিখেছিলেন—'ঝিম, ঝিম, ঘন ঘন রে বরষে'—একমাত্র শেষ অক্ষরের প্রতিবিম্ব ছাড়া বর্ষার বৈষ্ণবীয় দৃষ্টি অনুপস্থিত। বরং 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' কৃষকদের মুখের গানটি স্মরণযোগ্য।

"হেদে গো নন্দরাণী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।"

'কড়ি ও কোমলে'-র (১২) মথুরার কবিতায় মাথুর বিরহের স্মৃতি চিহ্ন দেখি—'বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই।, 'মানসীতে' দেখা যায় : 'এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।' তাই তিনি বলছেন 'মানসী-র' একাল ও সেকালে (১৩) :

"আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।"

এখানে রাধার বিরহ নয়—চিরকালের মানবীয় বেদনার শূন্যতার হাহাকার চিত্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে; চণ্ডীদাসের কবিতার সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে। সেটি হচ্ছে 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জন্ম জন্ম ধরে সৌন্দর্য দেখেন না—তিনি অনিত্য বস্তু থেকে দূরের দিগন্তে

মিলিয়ে যেতে চান। শেষের কবিতায় (১৪) অমিত লাবণ্যকে বলেছে—'নিবারণ চক্রবর্তী' বাসর ঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে; সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর...। রবিঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না।' এর মৌল কারণ উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্র মানস আলোকিত হয়েছিল। তাই 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেকঃ'—উপনিষদের বাণী আরোগ্যের ৯নং (১৫) কবিতায় প্রতিধ্বনিত করেন :

"বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্যতারা জ্বলে
যুগ যুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি.
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।"

'হিবার্ট' বক্তৃতায় (Hibbeart lecturer) (১৬) তিনি বলেছেন : "আমার গানগুলির প্রেরণা যে অদৃশ্য এবং চিহ্নহীন পথে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে সেই পথেই আমি আমার ধর্মের সমস্ত স্পর্শ লাভ করেছি।"

'শান্তিনিকেতনের' (১৭) জাগরণে কবির স্বপ্ন : 'সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপে আমার ভগবান্, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।' তবে ব্যক্তিত্ব-হারা অস্তিত্বতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অনস্তিত্বের সামিল। মানুষের ব্যক্তিত্ব ব্যতীত বিশ্বতির এই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না, তাই তাঁর ধারণা—

"বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগ যুগান্তর ধরে।
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন—
"কথা কও, কথা কও"
বলবেন "বলো, তুমি সুন্দর,"
বলবেন "বলো, আমি ভালবাসি।"

রবীন্দ্রনাথ দ্বৈত আদর্শে বিশ্বাস করেননি—তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। এজন্য 'ধ্যান' কবিতায় (১৮) শুধু 'তুমি'—'আমি'—তে বিশ্বাসযোগ্য করেননি...তাদের মধ্যে একটা গভীর আনন্দলীলার যোগের প্রশান্ত সুর নেমে এসেছে—এ যেন গীতাঞ্জলির সঙ্গীতাঞ্জলির মুহূরিত সুর :

"তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন
আমি অশান্ত বিরামবিহীন

চঞ্চল অনিবার—
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।"

এই 'তুমি' ও 'আমি' অর্থাৎ বড় আমি ও ছোট আমির পূর্ণতর রূপ এবং এর মিলিত অন্বয় বাচ্যর সত্তা তিনি অনুভব করতে সক্ষম হননি—তাই 'শেষ লেখায়' (১১) কবির শেষ বিস্ময় :

"প্রথম দিনের সূর্য—
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য—
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।"

রাবীন্দ্রিক ভাবনা, অন্বেষা ও কর্মচেতনা একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ থেকে সঞ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মনীষা বিশ শতকের জীবনদর্শনের চিন্তা বিচার ও অভিরুচিকে নতুন প্রাণ এবং রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছে। অতীতের জ্ঞানী ভারতের উপনিষদের সাধনা ও উপলব্ধির সত্যটিকে যিনি নব ভারতের অনুভবে সঞ্চারিত করেন—সাধারণ মানুষ তাকে নব যুগযাত্রার পথে চিরকালের সাথী করেছে। এই বৈদগ্ধ্যের ছায়ায় শেষকালে তার আলম্বন হয়েছে 'শিশুতীর্থের' (২০) চিরন্তন তীর্থঙ্করকে আমাদের 'শোকনীর জীবনবেদীতে' :

"তরুণের দল ডাক দিল,
'চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।'
হাজার কণ্ঠের ধ্বনি নির্ঝরে ঘোষিত হল,
'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।'
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহ সকলের এক।"

এই তীর্থপথিক একক ব্রহ্মসাধনা থেকে এসেছে। এই নবজাতকের বিজয়বার্তা চিরন্তন ও অন্তরস্পর্শী। অহং এখানেই হয়েছে ভূমা। এখানে ব্রহ্মও সর্বত্রগামী হয়েছে। প্রেয়সের শক্তিতীর্থে যাত্রার চরণ চিহ্নে যে দৈত জীবন থাকে, তা মিলিয়ে যায় উপনিষদের 'প্রাণপৈতি'তে বা শ-এর Life Force'-এ কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'চঞ্চলা'-র মধ্যে। তাই শরবিদ্ধ বলাকা আজ ব্যাকুল হয়ে নীড়ের আশ্রয়ে এগিয়ে চলে আর বলে এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য কোথায় আর

কোনখানে ? তবু বৈত জীবনের সাধনাও সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায় কারণ, "শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন একের সন্ধানে" (২১) আমাদের শেষ নমস্কার জানাতে হয়। তাই বৈষ্ণবীয় বৈত সাধনা রূপান্তরিত হয় একক ব্রহ্মসাধনার অরুণোদয়ে। তাই 'প্রান্তিকের' (২) পরমমূল্যে এর রূপাভাস পাওয়া যায় :

"দূর যুগান্তর হতে
মহাকাল যাত্রা মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখদিকে
আমার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।"

এখানেই বৈষ্ণবীয় বৈত সাধনা যেন রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যঞ্জনায় একের সন্ধানে চির যাত্রার স্মৃতি-চিহ্ন বহন করেছে।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের অবৈত ভাবব্যঞ্জনায় আপন জীবন জিজ্ঞাসাকে প্রোৎসাহিত করেন বলেই বৈষ্ণবীয় বৈত লীলাবৈচিত্র্যকে স্বীকার করেন নি। এছাড়া, বৈষ্ণবরা প্রেমের বৃন্দাবনকে অপ্রাকৃত ভাব বৃন্দাবনে প্রকাশিত করেন এবং প্রাকৃত মানবী রমণীকে 'মাদনাখ্য মহাভাবের' অপ্রাকৃত নায়িকা করেন—এগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। কারণ তিনি বৈষ্ণবীয় চিন্তা-ভাবনায় সাধারণ প্রাকৃত প্রেমের চিত্রনাট্য দেখেছিলেন। তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন :

"পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন,
বৃন্দাবন গাথা—এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে, এ কি শুধু দেবতার !"

বৈষ্ণবরা দেবতাকে প্রিয় করেছেন—কিন্তু প্রিয়কে দেবতার আসনে বসাননি। কারণ 'কৃষ্ণরতি' তাদের স্থায়ীভাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেবতা ও মানুষকে এক আসনে বসিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে আমাদের প্রেমের মালাখানি এতই পবিত্র এবং সুন্দর যে সেটিকে একসঙ্গে আমার দয়িত ও আমার দেবতার গলায় দিতে পারব ; কিন্তু বৈষ্ণবরা দয়িতের প্রাকৃত মালা অপ্রাকৃত দেবতার শ্রীচরণেও সংস্থাপন করবেন না। এখানেই রবীন্দ্রভাবাদর্শের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনার মধ্যে বৃহৎ ফাটল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানেই বলেছেন :

"দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে—আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

সমুদ্রবাহিনী প্রেমধারা থেকে কলসি ভর্তি জল নিয়ে আপন কুটিরে যে প্রেমের সুখনীড় গড়ে উঠছে—তা অস্বীকার করে তাকে দৈব আভিনায় স্থাপনের হেতু কি। এজন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকারদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষ :

"তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যার ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।"

বৈষ্ণবীয় আদর্শ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি বলেই "বৈষ্ণব কবিতায়" প্রশ্ন করেছেন—"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!"=

*উদ্ধৃতি অংশ পরিচিতি :

(১) 'কঠোপনিষদ'—২।২।১২,
(২) 'Religion of Man',
(৩) 'গ্রাম্য সাহিত্য'—১৩০৫,
(৪) 'সোনার তরী'র—'বৈষ্ণব কবিতা',
(৫) 'সাহিত্য'—১৩১৩,
(৬) 'শ্যামলী'-র 'স্বপ্ন' কবিতা (১৩৪৩),
(৭) বাংলা ভাষা পরিচয় (১৩৪৫),
(৮) জীবনস্মৃতি গ্রন্থ,
(৯) 'ভানুসিংহের পদাবলী',
(১০) 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ,
(১১) 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৮৭),
(১২) 'কড়ি ও কোমল'-এর মথুরায়,
(১৩) 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল',
(১৪) 'শেষের কবিতা' দ্রষ্টব্য,
(১৫) 'আরোগ্যে'—৯নং কবিতা,
(১৬) 'Hibbert Lecture',
(১৭) শান্তিনিকেতন,
(১৮) 'ধ্যান' কবিতা,
(১৯) শেষ লেখা,
(২০) 'শিশুতীর্থ, কবিতা
(২১) 'বলাকা'—৩৬ ও ৩৭ নং কবিতা,
(২২) 'প্রান্তিক'—এর পরমমূল্য দ্রষ্টব্য।

ভাইরাস

অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র

এক ছুটির দিনে "লা কাফে"তে বসে চা খাচ্ছি।

হঠাৎ সমীরের আবির্ভাবে বেশ খুশি হোলাম—জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হোল বিমর্ষ ও বেশ উদ্বিগ্ন। প্রফুল্লকে চায়ের অর্ডার দিয়ে সমীরকে প্রশ্ন করলাম, কিরে, কি ব্যাপার? তোকে চিন্তিত মনে হচ্ছে?

সমীর উত্তর দেয় না। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে বলে—আচ্ছা, তুই তো প্রোটিন, ডি এন্ এ, ব্যাক্টেরিয়া ভাইরাস সম্পর্কে কী সব পড়াশোনা করিস মাঝে মাঝে। আমাকে ভাইরাস সম্পর্কে কিছু বল্ দেখি।

—কি ব্যাপার? হঠাৎ ভাইরাস নিয়ে এত আগ্রহ কেন?

—নারে, এই সেদিন চোখের রোগে ভুগলাম, বাড়ির কেউই বাদ গেল না। ঐ রোগ নাকি ভাইরাস থেকে। আর কয়েকদিন আগে সংবাদ পেলাম, অতি পরিচিত এক আত্মীয়ের ক্যানসার হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ক্যানসারের হেতু ভাইরাস বীজাণু। সেদিন এক ডাক্তারখানায় ডাক্তারবাবু রোগীকে বলছেন—সাবধানে থাকবেন ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্দি যেন না হয় বা সর্দি হয়েছে এমন কারো কাছ হতে দূরে থাকবেন; সর্দিও সংক্রামক এবং তার কারণও ভাইরাস রোগবীজাণু। প্রায়ই শুনি ভাইরাস সংক্রমণের (virus infection) কথা নাম-না-জানা অসুখের ক্ষেত্রে। কিন্তু ভাইরাস রোগবীজাণুর বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

—ভাইরাস সম্পর্কে আমার জ্ঞানও খুবই সীমিত। তবে মোটামুটি ধারণা যাতে হয়, সে রকম কিছু কথা তোকে বলতে পারি ভাইরাস সম্পর্কে। ভাইরাস সত্যিই খুব আশ্চর্য জিনিস। জীবনের সীমারেখায় এর অবস্থান।

—ভাইরাস আসলে কি? এর প্রাণ আছে, না নেই?

—সাধারণতঃ ভাইরাস প্রাণহীন জড়পদার্থ। জড় ও প্রাণহীন অবস্থায় বছরের পর বছর, অনির্দিষ্ট কাল অবিকৃত ভাবে থাকতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণের লক্ষণ দেখা যায়। কোন সজীব জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বংশবৃদ্ধি করে। এই বংশবৃদ্ধি জীবনের অন্যতম লক্ষণ। ভাইরাসের প্রাণের স্পন্দন দেখা যায় অন্য জীবকোষের মধ্যে, বংশবৃদ্ধির জন্য অন্য জীবকোষ একান্ত প্রয়োজন এবং অপরিহার্য। সেজন্য ভাইরাসকে পরজীবী বলা চলে। যে কোন সজীব বস্তু বা প্রাণীর প্রধান উপাদান হোল নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন; এই দুই উপাদান প্রতি ভাইরাসেই বর্তমান।

—ভাইরাসের আকৃতি কত বড় ?

—ভাইরাসের আকৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কয়েকটি বিশেষ ভাইরাস ছাড়া সাধারণতঃ ভাইরাস আলোক-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়। অবশ্য ইলেকট্রণ-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে ভাইরাস দেখা যায়, তার কারণ এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুকে দুই লক্ষ হতে পাঁচ লক্ষ গুণ বর্ধিত অবস্থায় দেখা যায়। ভাইরাসের আকৃতি সাধারণতঃ ১০ হতে ৬০ মিলিমাইক্রন।

—মিলিমাইক্রন কি ?

—মিলিমাইক্রন হোল দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্রতর একক। এক মিটারের শতাংশকে সেন্টিমিটার এবং সহস্রাংশকে মিলিমিটার বলা হয়। মিটারকে ১০০০,০০০,০০০ (একশত কোটি) অংশে ভাগ করলে ঐ ক্ষুদ্রতর এককে মিলিমাইক্রন বলা হয়। বত্রিশ বছরে যত সেকেণ্ড, এক মিটারে প্রায় তত মিলিমাইক্রণ। ভাইরাসের আকৃতি কত ক্ষুদ্র এবার কল্পনা করতে পারছিস বোধহয়।

—এত ক্ষুদ্র বস্তুর কল্পনা করা সত্যি কষ্টকর। এদের চেহারা কেমন জানা গেছে কি ?

—বিভিন্ন ভাইরাসের চেহারা বিভিন্ন রকমের। তার মধ্যে কোন ভাইরাস গোল বলের মত, কোনটি রডের মত, কোনটি পাউরুটির মত দেখতে। তবে আগেই বলেছি কেবল ইলেক্টন-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা সম্ভব, এতই ক্ষুদ্র এদের চেহারা। তবে কোন কোন ভাইরাস কয়েক কোটি একত্রে মিলে একটি কেলাস (crystal) এর রূপ নেয়। সেটি খালি চোখে দেখা যায় এবং যে কোন অজৈব বা জৈব রাসায়নিক কেলাসের মত বহুদিন সংরক্ষিত করে রাখা যায়। পোলিও রোগের ভাইরাস বীজাণু একত্রিত হয়ে সুন্দর কেলাস বা স্ফটিকের আকার গ্রহণ করে। তামাক পাতার এক প্রকার রোগের ভাইরাস (T. M. V.—Tobacco Mosaic Virus) সুন্দর স্ফটিকের আকারে গঠন করা যায়।

তাহলে ঐ স্ফটিক বা কেলাসিত (Crystal) অবস্থায় ভাইরাসকে প্রাণহীন জড় পদার্থ হিসাবে গণ্য করা চলে নিশ্চয়।

—ঠিক ভাই। কিন্তু কোটি ভাইরাসের সমষ্টি ঐ কেলাস দ্রবীভূত ক'রে যদি মাত্র একটি ভাইরাসকে গাছ, মানুষ বা কোন জীবজন্তুর জীবকোষের মধ্যে ঢুকতে সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে ঐ একটি ভাইরাসই অনুকূল পরিবেশে কোটি কোটি ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে এবং তখন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

—বুঝতে পারছি যে, একটি মাত্র ভাইরাস হতেও রোগ লক্ষণ প্রবেশ করে দেহের অভ্যন্তরের জীবকোষে ? ঐ প্রবেশপথে বাধা সৃষ্টি করা যায় কিনা ?

ভাইরাসের নিজের চেহারার মধ্যে চলাচল করার মত কোন অংশ নেই। তবু জল—স্থল—অন্তরীক্ষে ভাইরাসের অবাধ বিচরণ।

—তা কিভাবে সম্ভব ? যাতায়াত করে কি ভাবে একস্থান হতে অন্যত্র ? এবারে তো

চোখের অসুখ দেখা দিল প্রথমে বোম্বেতে! তার কয়েক সপ্তাহ পরে কোলকাতায় শুরু হোল।

—ভাইরাস রোগবীজাণু বাতাসে ভেসে একস্থান হতে অন্যত্র যেতে পারে। তাছাড়া নৌকা, জাহাজ, এরোপ্লেনের মাধ্যমে দূরদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরোপ্লেন বা তার যাত্রীদের মাধ্যমে অতি দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। দূর দূরান্তরে। পাখি, পোকামাকড়ের মাধ্যমেও বিভিন্ন স্থানে, এক দেহ থেকে অন্য দেহে ভাইরাস বীজাণু চলে যেতে পারে। হাম, পোলিও, বসন্ত প্রভৃতি রোগের ভাইরাস বীজাণু স্পর্শের দ্বারা, হাঁচি কাশির দ্বারা সংক্রমিত হয় এক দেহ হতে অন্য দেহে। মশার একবার কামড়ে পীতজ্বর বা ডেঙ্গুর এক লক্ষ ভাইরাস বীজাণু দেহে প্রবেশ করতে পারে।

—সাধারণতঃ কি কি রোগ ভাইরাস রোগবীজাণু হতে হয়? যক্ষ্মা, বসন্ত, নিউমোনিয়া, কলেরা, পোলিও বা ডেঙ্গু সব রোগই কি ভাইরাস বীজাণু হতে হয়?

—না। না। সবগুলি ভাইরাসজনিত রোগ নয়। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতির রোগবীজাণু ব্যাক্টেরিয়া জাতীয়। কিন্তু হাম, মাম্পস্, চিকেনপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও পীতজ্বর, সর্দি প্রভৃতির রোগবীজাণু ভাইরাস জাতীয়। কয়েকটি জীবজন্তুর ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগের ভাইরাস বীজাণু পাওয়া গেছে। মানুষের ক্যানসার রোগে এখনও সঠিক-ভাবে কোন ভাইরাস বীজাণু পাওয়া যায়নি।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। কলেরা, টাইফয়েড আজকাল তো আশঙ্কাজনক নয়। যক্ষ্মাও সহজেই নিরাময় হয়—প্রাণনাশের কোন আশঙ্কা নেই, যদি না অত্যন্ত অবহেলা করা হয়। কিন্তু ভাইরাসজনিত রোগ দুরারোগ্য কেন? বিজ্ঞানের জয়-জয়াকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। চাঁদের মাটিতে আজ গাড়ি চালাচ্ছে পৃথিবীর মানুষ; গ্রহগ্রহান্তরে মানুষের জয়যাত্রা এখন আকাশ-কুসুম কল্পনা তো নয়ই, অত্যন্ত সহজ সম্ভাব্য ঘটনা। কিন্তু ভাইরাসজনিত কয়েকটী রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অসাফল্য বিস্ময়কর!

প্রশ্নটা ভালই করেছিস। এটা বুঝতে হলে একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে ভাইরাসের গঠন প্রকৃতি, বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি এবং ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের পার্থক্য।

—ঠিক আছে। আর একটু ধৈর্য ও সময় না হয় ব্যয় করলাম যদি একটু জ্ঞান লাভ হয়। তবে আর একবার চায়ের দরকার।

ধৈর্য ধরে নীরস বিষয় শোনার আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে একটু উৎসাহ পেলাম। খুশির আমেজে চায়ের সঙ্গে ওমলেটের অর্ডার দিলাম। আবার শুরু করলাম।

খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, ব্যাক্টেরিয়া একটি এককোষী জীব—অবশ্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ জীবকোষ। কোষের মধ্যে বিভিন্ন এনজাইম (enzyme) বা অনুঘটক আছে, যা প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান তৈরী করে খাদ্যবস্তু হতে (DNA) ডি, এন্, এর নির্দেশ অনুসারে। আর ভাইরাসের উপাদান সরলতম মাত্র দুটি রাসায়নিক পদার্থ প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের সমবায়ে গঠিত একটি বস্তু-কণিকা, যার মধ্যে প্রাণের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায় বিশেষ পরিবেশে।

ব্যাক্টেরিয়া বীজাণু আলোক—অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ভাইরাস বীজাণু আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ভাইরাস বীজাণু আলোক-অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়—একথা আগেই বলেছি। ব্যাক্টেরিয়া বীজাণু ভাইরাসের চেয়ে প্রায় ১০০,০০০ গুণ বড়। স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাক্টেরিয়া বীজাণু অনুকূল পরিবেশে খাদ্যের সাহায্যে কোষ-বিভাজন পদ্ধতিতে অনায়াসে বংশ-বৃদ্ধি করে। কিন্তু ভাইরাস বীজাণুর পক্ষে কোন সজীব সুস্থ জীবকোষের একান্ত প্রয়োজন। জীবকোষের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর ঐ জীবকোষের পূর্ণ সহযোগিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। ব্যাক্টেরিয়া রোগবীজাণু জীবকোষকে আক্রমণ করার পর, উভয়ের সংঘর্ষে জয়পরাজয়ের ওপর নির্ভর করে রোগের প্রকাশ ও বৃদ্ধি হবে কিনা। অপর দিকে, আক্রান্ত জীবকোষের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত ভাইরাস রোগবীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব নয়; কারণ জীবকোষের উপাদানের সাহায্যেই নতুন ভাইরাস বীজাণু গঠিত হয়। অবশ্য প্রথমে জীবকোষ নিজের সংস্পর্শে ভাইরাসকে প্রাথমিক বাধা কোনপ্রকারে দূর হয়ে গেলে জীবকোষের উপাদানগুলি হৃষ্টচিত্তে ভাইরাসের নির্দেশ মেনে চলে এবং নূতন ভাইরাস সৃষ্টি করতে সাহায্য করে অর্থাৎ নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই তৈরী করে। উদাহরণস্বরূপ একটি স্বয়ংশাসিত লৌহ ও ইস্পাত সংস্থার কথা ধরা যেতে পারে, যেখানে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরী হয় এবং তার সাহায্যে নতুন নতুন কারখানা খোলা যেতে পারে। এখন হঠাৎ কোন বিদেশী গুপ্তচর যদি ঐ কারখানার অংশীদার বা পরিচালকরূপে আসে এবং আদেশ দেয় সাধারণ উৎপাদন বন্ধ রেখে বুলেট ও নানা অস্ত্র উৎপাদনের জন্য, কর্মীরা তখন প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ আদেশ মান্য করে অস্ত্র উৎপাদন করে যায়; জানতেও পারে না ঐ অস্ত্র তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

এই—উপমা কিন্তু খুব ভালো হ'ল না। কারণ যেহেতু, ধর্মঘট না ক'রে কর্তৃপক্ষের এমন আজগুবি নির্দেশ কর্মীরা মেনে চলবে—এ ভাবা যায় না।

—উপমা একেবারে যথাযথ হয় না সব সময়। তবু বাংলাদেশের কথা ভেবে দ্যাখ্। বাংলাদেশের যন্ত্রকারখানায় তৈরী অস্ত্রশস্ত্র তাদের নিজেদের আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গের মৃত্যুর জন্য ব্যবহৃত হবে একথা কি বাঙালী কর্মীরা কোনদিন ভেবেছিল। জল্লাদ ইয়াহিয়ার মত বর্বর পশুর হাতে এমন অঘটন আজো ঘটে তা দেখাই যাচ্ছে। তবে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর পাচ্ছে এবং পাবে। যাক্, আমরা ভাইরাস প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড, আক্রান্ত জীবকোষে প্রবেশের পর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মত আদেশ দেয় ভাইরাস গঠনের উপযোগী উপাদান (ভাইরাস-প্রোটিন ও ভাইরাস-নিউক্লিক এসিড) তৈরী করার জন্য। জীবকোষে অবস্থিত বিভিন্ন অনুঘটক (enzyme) কারখানার কর্মীদের মত আদেশ পালন করে এবং নতুন ভাইরাস বীজাণু গঠনে পূর্ণ সহযোগিতা করে।

—যাইহোক, খাদ্য ও অনুকূল পরিবেশে বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাক্টেরিয়া বীজাণুর স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ভাইরাস রোগবীজাণুর জন্য সুস্থ জীবকোষের উপর নির্ভরতার ব্যাপারটা বুঝলাম।

—সে সুস্থ জীবকোষের কোন অসুবিধা বা অনিষ্ট না ক'রে ব্যাক্টেরিয়ার ধ্বংস করা যেতে পারে, অথবা তাদের বংশবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব, যাতে রোগের বৃদ্ধি না ঘটে। পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসীন, টেরামাইসীন, ক্লোরোমাইসিটিন ইত্যাদি এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের সাহায্যে ব্যাক্টেরিয়া রোগবীজাণু ঘটিত অসুখের চিকিৎসা করা হয় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। ভাইরাস রোগবীজাণুর ক্ষেত্রে অনুরূপ পদ্ধতি সম্ভব নয়। তার কারণ, সুস্থ জীবকোষের বিভাজন বন্ধ বা অনিষ্টসাধন না ক'রে ভাইরাসের অনিষ্ট বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। সুস্থ জীবকোষের কোন ক্ষতি না ক'রে কেবলমাত্র ভাইরাস রোগবীজাণু ধ্বংস করে—এমন ওষুধের আবিষ্কার আজও হয়নি, এবং তা সহজ ব্যাপার নয়।

—তার মানে, ভাইরাস রোগবীজাণুর কাছে আমরা এখনো অসহায়। ভাইরাসজনিত রোগের কি কোন সফল চিকিৎসা নেই বা প্রতিকারের পথ নেই?

—মাইসীনজাতীয় ব্রড স্পেকট্রামের কিছু ওষুধ ভাইরাস জনিত রোগের ক্ষেত্রে যন্ত্রণার উপশম দেয়। তবে প্রতিরোধের জন্য সফল ও সুনির্দিষ্ট পথ হোল টীকা নেওয়া। টীকা নেওয়া হলে ঐ বিশেষ রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

—টীকার সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ কিভাবে হয়?

—টীকা দেওয়া আসলে রোগের মৃত বা মৃদু শক্তিসম্পন্ন রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ঐ রোগের বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (antibody) গড়ে ওঠে, যারা পরবর্তী সময়ে বহিরাগত ঐ রোগের শক্তিশালী রোগবীজাণুকে প্রতিহত করে এবং রোগ আক্রমণ হতে রক্ষা করে। এ যেন সম্ভাব্য আক্রমণের কথা ভেবে সামরিক মহড়া দিয়ে সৈন্য ও প্রতিরক্ষাবাহিনী শক্তিশালী ও সজাগ রাখা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা—যারা দু-একজন গুপ্তচর বা নাশকতা-মূলক কাজে লিপ্ত বিদেশী চরকে ধরে চরম সাজা দিতে পারে।

—কিন্তু বসন্তের টীকা নেওয়ার পরও বসন্ত রোগ হতে দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে। টীকা নেওয়া সত্ত্বেও আমারই একবার বসন্ত হয়েছিল। টীকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

—নিশ্চয়ই তোর গুটিবসন্ত (Small pox) হয়নি, জলবসন্ত (Chicken pox) হয়েছিল—যার রোগযন্ত্রণা এবং অনিষ্টকারিতা গুটিবসন্তের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণতঃ বসন্তের যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে—তা গুটিবসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য। ঐ টীকা ভিন্নজাতীয় জলবসন্ত রোগবীজাণু প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম নয়। প্রত্যেক ভাইরাস রোগবীজাণুর জন্য ঠিক সেই জাতীয় প্রতিষেধক বা টীকা প্রয়োজন। বিশেষ তালার জন্য যেমন বিশেষ একটি চাবিকাঠি প্রয়োজন; দেখতে প্রায় একরকম অন্য চাবিকাঠি দিয়ে বন্ধ তালা খোলা যায় না।

—সে কথা না হয় বুঝলাম। কিন্তু বিভিন্ন রোগের আশঙ্কা ক'রে হাজার রকম টীকা

নেওয়া। সাধারণ মানুষের পক্ষে ভীতিপ্রদ ও অসম্ভব ঘটনা। এরূপ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ অবাস্তব।

—সেকথা ঠিক। যে সব ভাইরাসজনিত রোগের মেয়াদ কয়েকদিন মাত্র এবং প্রাণের আশঙ্কা নেই, সেসব ক্ষেত্রে রোগযন্ত্রণা সহ্য করা যেতে পারে। কিন্তু যেক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা বা পঙ্গু হয়ে থাকার সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে সাবধান হওয়া প্রয়োজন; সেই সব রোগের জন্য আগে হতে টীকা নেওয়া একান্ত কর্তব্য বা রোগের প্রাদুর্ভাব হলে সংক্রমণের আগে টীকা নেওয়া উচিত।

—আচ্ছা, ক্যানসার রোগ কি ভাইরাস রোগবীজাণু হতে হয়? এ সম্পর্কে তোর কতদূর জানা আছে?

—মানুষের ক্যানসার রোগের হেতু ভাইরাস বীজাণু কিনা জানার জন্য গবেষণা চলছে। তবে র‍্যাট, ইঁদুর, মুরগী প্রভৃতি প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে—ভাইরাস রোগ-বীজাণুই ঐসব প্রাণীদেহের কোন কোন ক্যানসার রোগের কারণ। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোন বিশেষ ক্যানসার রোগের ভাইরাস কোন বিশেষ এক প্রকার জন্তুকে আক্রমণ ক'রে রোগের প্রসার ঘটায়; কিন্তু অন্য জন্তুর ক্ষেত্রে ঐ ভাইরাস আক্রমণ ক্ষতিকর নয়। আবার এও দেখা যায় পরীক্ষার জন্য কোন ক্যানসার—ভাইরাস প্রাণীর দেহে বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিয়ে দিলেও সব সময় দেহের ত্বকটি বিশেষ অংশে ঐ ক্যানসার রোগের সূত্রপাত হয়। বহু বৈজ্ঞানিক বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ক্যানসার রোগের রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছেন। ধীরে ধীরে কিছু অগ্রগতিও হচ্ছে এবিষয়ে। মানুষের ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগের সঠিক কারণ বা রোগবীজাণু সঠিকভাবে যদি নির্ণয় করা যায়, তবে চিকিৎসা বা নিরাময়ের পদ্ধতি অচিরে পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে ক্যানসার রোগের বীজাণু আবিষ্কারের খবর পাওয়া যায়, কখনও বা বিশেষ কোন ওষুধ আবিষ্কারের উল্লেখ থাকে। কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত কোন ওষুধ আবিষ্কার আজও হয়নি ক্যানসার সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য! তবে প্রথম অবস্থায় ঐ রোগ ধরা গেলে রঞ্জন রশ্মি বা (রেডিয়াম্ বা কোবাল্ট-৬০ নির্গত) বীটা বা গামা রশ্মি দ্বারা সতর্কতার সঙ্গে আক্রান্ত জীবকোষকলাকে (tissue) নষ্ট ক'রে ফেলা যায়। অপারেশন দ্বারাও ঐ জীবকোষকলা অপসারিত করা যায়! কিন্তু মুস্কিল এই যে, ক্যানসার রোগ খুব কম ক্ষেত্রেই প্রথম অবস্থায় ধরা যায়।

—যাক্, ভাইরাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ হোল।

—কিন্তু ভাইরাস এর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে—তার কিছুই বলা হয়নি। ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞানের এক নূতন দিগন্তে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

—কোন বিশেষের কথা বলছিস্, বুঝলাম না।

—আমি জেনেটিক্স্ বা বংশগতিবিদ্যার কথা বলছি। একথা নিশ্চয় জানা আছে যে, জন্মগত বৈশিষ্ট (hereditary characterestics) সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জীবকোষে

অবস্থিত ক্রোমোজোমের মধ্যে জীন (gene) গুলির উপর। প্রায় একশ' বছর আগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জীন সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন মেণ্ডেল নামে ভিয়েনার এক পাদ্রী। ইতিমধ্যে জীনের রাসায়নিক পরিচয় স্পষ্টভাবে জানা গেছে। জীনের রাসায়নিক পরিচয় হচ্ছে "ডি-অক্সি-রাইবো নিউক্লিক এসিড" (Deoxy-ribo Nucleic Acid) সংক্ষেপে ডি. এন্. এ. (D.N.A)। বংশগতির ধারক ও বাহক এই জীন সম্পর্কে সকলের কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল। এই নতুন বিষয় (genelics) নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহে বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজ চলেছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (ভারতীয়) ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখন নিশ্চিন্তভাবে জানা গেছে যে ভাইরাস, ক্যানসার জীন এবং জীবন সব প্রত্যক্ষভাবে নিউক্লিক এসিডের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ জীবনের মূলসূত্র হোল নিউক্লিক এসিড। এই নিউক্লিক এসিডের কার্যপ্রণালী বোঝার ক্ষেত্রে ভাইরাসের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ ভাইরাসের উপাদান সরল এবং ভাইরাস থেকে নিউক্লিক এসিড নিষ্কাষন করা এবং শুদ্ধীকরণের পর সেই নিউক্লিড এসিড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

—জীন সম্পর্কে জানার আমার প্রচণ্ড কৌতূহল আছে। তবে আজ নয় অন্যদিন। অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। চল, ওঠা যাক্।

আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে বাঙালী জীবনের প্রভাব

শৈলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ, সাম্মাণিক বাঙলা

শরতের নির্মল আকাশে, হাল্‌কা হাওয়ায় পেঁজা তুলোর মত মেঘেরা যখন আনাগোনা করে, শিউলী শারদ প্রাতে কাঁসের গুচ্ছ যখন মাথা নেড়ে চামর দোলায়, তখন চারদিকে একটি কথাই কেবল কানাকানি করে : মা আসছেন ! মা অর্থাৎ জগন্মাতা, দেবী দুর্গা, স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহে আসছেন। মা'র এই আগমন উপলক্ষ ক'রে অন্তরের যে আনন্দের অভিব্যক্তি তারই প্রকাশ এই আগমনী গানে।

আগমনীগানে তৎকালীন বাংলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল। আগমনীগানের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি পৌরাণিক। কিন্তু তারা যেন বাঙালী গৃহের মানুষগুলির দেবকল্প মূর্তি—তারা যেন দেবতার ছদ্মবেশে রক্তমাংসের মানুষ। গিরিরাজ হিমালয় যেন আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের পিতা ; মা মেনকাকে যেন আমরা কন্যা বিচ্ছেদে—ব্যাকুল বাঙালী মা ছাড়া ভাবতেই পারি না। মহাকাল শিব যেন আমাদের ঘরেরই গরীব জামাই ; আর গৌরী-উমা আমাদের চিরদুঃখিনী কন্যা। তাকে যেন কোন মতেই অসুর নাশিনী, দনুজদলনী রূপে কল্পনা করতে পারি না। কৈলাস ও হিমালয়ও যেন তাদের স্বাভাবিক দূরত্ব হারিয়ে পল্লিবাঙলার শ্যামল স্নিগ্ধ গ্রামে পরিণত হয়েছে।

গিরিরাজ কন্যা গৌরী উমা কৈলাসবাসী মহেশের ঘরণী। অবস্থার চাপে গিরিরাজ হিমালয় বৃদ্ধ মহেশের সঙ্গে উমার বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। আমাদের বাঙালী ঘরের পিতাকেও কৌলিন্য প্রথার প্রভাবে, কুল রক্ষার খাতিরে, তার 'অষ্টমা গৌরী' কন্যার বিবাহ দিতে হয় সমাজপতি কুলীন বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে। সমাজের যূপকাষ্ঠে বালিকা কন্যাকে বলি দিতে হয়। 'গৌরীদান'—প্রথার প্রতিবাদে উমা ভ্রাতা মৈনাক সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেয়। এটি তদানীন্তন যুবসমাজের, সমাজ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। সমাজের অপব্যবস্থার জন্যই যুব সমাজে এই অপমৃত্যু !

সমাজের বলি এই সব বালিকা-বধূকে চিরদিনের পরিচিত মা-বাবা-ভাই-বোন সকলকে ছেড়ে শ্বশুর ঘর করতে যেতে হয়, সতীনের সংসারে। একান্নবর্তী সংসারে গিয়ে বহু সতীনের মাঝখানে এই কুমারী উমার দল বিভ্রান্ত ও ভীতচকিত হয়। সংসারের নানা দুঃখ কষ্টে গৌরী উমার গৌরবর্ণ বদ্ধ হয়ে যায় কালিবর্ণ। অভাব অনটনে গৌরবর্ণা উমা কৃষ্ণবর্ণা নিমাংসা চামুণ্ডাতে রূপান্তরিত হন, আর শিব কুধার জ্বালায় গরল অর্থাৎ বিষপান করে

নীলকণ্ঠরূপে সমুদ্ভাসিত হন। অভাব অনটনের মাঝখানে বাঙালী দরিদ্র গৃহের চিত্রটির মধ্যে গৌরীর কালীতে রূপান্তরিত হবার ব্যাপারটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আগমনীগানের মধ্য দিয়ে বাঙালীর চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। উমা-শঙ্করের গৃহস্থালী যেন বাঙালী মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। ছল ছল চোখে বালিকা-কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি বিদায় দিয়ে মা তার বৎসরান্তে আগমনের দিনটির দিকে চেয়ে থাকেন।

কন্যাবিচ্ছেদজনিত ব্যথায় জননীর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বছরও অতিক্রান্ত হয়। বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার কন্যাকে পিতৃগৃহে আসতেই হবে। মা মেনকা গৌরীকে নিয়ে আসার জন্য গিরিরাজকে তাগাদা দেন :—

"যাও, যাও গিরি, আনিতে গৌরী,
উমা আমার কত কেঁদেছে।"

কন্যা অদর্শনে মায়ের প্রাণ বড়ই উতলা হয়, ব্যাকুল হয়ে বলেন :

"কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুলা হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে ;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।"

এ যেন আমাদের ঘরের বাঙালী মায়ের চিরন্তন বুকভাঙা আর্ত চিৎকারে মায়ের প্রাণ তার মেয়েটিকে কাছে পেতে ছটফট করে, মেয়ের মুখ দেখেনি কতদিন।

রাজার কন্যা উমা ভিখারী মহেশের গৃহিণী, না জানি সেখানে উমা কত কষ্টেই আছে। অভাব অনটনে সোনার অঙ্গ কালী হয়ে গেছে, সে উমাকে যেন আর চেনাই যায় না! মায়ের প্রাণে বড় কষ্ট! আগমনীতে সাধক কবি তাই বলেছেন :

"বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ;
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।"

কন্যার চিন্তা জননীর সব সময়ই। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নেও কন্যাকে দেখেন, সে যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে. হেসে কথা বলেছে, 'মা' বলে ডেকেছে। ঘুম ভেঙে গেলে স্বপ্ন টুটে যায়, মায়ের প্রাণ নিরাশায় ভরে উঠে—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো।"

কন্যাকে আনার ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গিরিরাজ ও মেনকার মধ্যে কলহ বাধে—

"গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপানি,
তারে দিয়ে নন্দিনী
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥"

গিরিরাজ কন্যা বিরহবিহ্বলা মেনকাকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মায়ের প্রাণ মানে না—

"ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে, কারে দিয়ে, হয়েছ পাষাণ॥"

তাও মেয়ে যদি বিত্তবান স্বামীর ঘরে যেত, তাহলে কথা ছিল, জামাই ভিখারী, তাইতো মায়ের প্রাণ সদা অমঙ্গল আশঙ্কা করে। তার ওপর সতীনের সংসার, কন্যার অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে মেনকার চিত্ত বিচলিত হয়—

"নয়নীর পুতলি তারা, রবি করে হয় সারা;
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান।
ঘরেতে সতিনী-জ্বালা, সদা করে জ্বালাপালা,
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ॥"

কোমলপ্রাণা বঙ্গজননীর করুণ মিনতি যেমন বাপ উপেক্ষা করতে পারেন না, তেমনি মা মেনকার মিনতি কঠিন গিরিরাজকেও পেলবতায় দ্রবীভূত করে:

"গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাস পুরে।"

মেনকার অশ্রুজলে অনুতপ্ত গিরিরাজ বলেন,—

"আর কেন কাঁদ রাণি, উমারে আনিতে যাই।"

গিরিরাজ কৈলাসে চলেছেন কন্যাকে নিয়ে আসতে, জামাইও যাতে আসেন তার জন্য মেনকা বারবার বলে দিচ্ছেন—

"গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন॥"

মা মেনকাকে যেন আমরা কন্যা বিচ্ছেদ ব্যাকুলা বাঙালী মা ছাড়া ভাবতেই পারি না।

গিরিরাজ উমাকে আনতে গেছেন, মা মেনকা ঘর বার করেন, আর ভাবেন—

"উমা আমার আসে বুঝি,
উমা আমার আসে রে।"

প্রতিবেশীর মুখে কন্যার আগমন বার্তা শুনে প্রতীক্ষামানা বাঙালী মা স্থির থাকতে পারল না, পথে অগ্রসর হয়ে কন্যাকে বরণ করে নেন। তেমনি মা মেনকাও—

"শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাব-ভরে, বর বর আঁখি ঝরে, পাছে করি' গিরিবরে,
অমনি কাঁদে গলা ধরে॥"

মিলনের পর্ব সাঙ্গ হলে মায়ের মনে পড়ে ভাইতো, অনন্তের আভিশয্যে মেয়ের খবর তো নেওয়া হয়নি, সেখানে সে কেমন ছিল—

"ওমা, কেমন করে পরের ঘরে
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই।"

আমাদের বাঙালী ঘরের মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। স্বামীর ঘর সে তো নিজের ঘর, সেখানে দুঃখকষ্ট সেতো নিজের। মেনকার মনের সন্দেহ দূর করার জন্য উমা কৌশলে বলে—

"কে বলে মা দরিদ্র হর,
রতনে খচিত ঘর মা
জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।"

সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হয় মা'র প্রাণে তাই ভয়, না জানি তারা উমাকে কত কষ্ট দেয়। উমা তাই বলে :—

"শুনেছ সতীনের ভয়,
সে সকল কিছু নয় মা,
তোমার অধিক ভালবাসে……।"

বেশ আনন্দে দিন কাটে। বাপের বাড়ি কদিন থাকার পর স্বামীর ঘরে যাবার ডাক আসে। মেয়ের উপর মা-বাপের কোন জোর নেই, বিয়ের পর মেয়ে পর হয়ে যায়—এ কথা কেন বাঙালী মা বুঝেও বোঝেন না। জননী মেনকার কথায় বাঙালী মায়ের সেই কর্মকথাই ব্যক্ত হয়েছে—

"তনয়া পরের ধন,
বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার।"

আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় মায়ের হৃদয় ভারী হয়। নবমীর দিন থেকে মনে শোকের ছায়া নেমে আসে। যতই বেলা বেড়ে চলে মা মেনকার মন ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বেলা শেষে আসবে সন্ধ্যা, তারপর রাত্রি, রাত্রি অবসানেই বিদায়ের করুণ সুর ধ্বনিত হতে থাকবে। তাই মায়ের প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা—

"যেও না, যেও না, নবমী রজনি,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।"

কিন্তু মায়ের ব্যাকুল করুণ প্রার্থনা সত্ত্বেও নবমী-নিশি প্রভাত হয়। আসে দশমী। বিদায়ের পালা। সে এক মর্মন্তুদ অবস্থা। মায়ের স্নেহাঞ্চল থেকে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়। মা মেনকা আমাদের বাঙালী জননীর মত রাগে দিশাহারা হয়ে বলেন—

"হর এবার যান ফিরে, উমারে রাখিব ঘরে,
এতে যদি কৃত্তিবাসের মনেতে রাগ হয়—হ'লো॥"

যতই ঝগড়া করুক না কেন শেষ পর্যন্ত চোখের জলে মেয়েকে বিদায় দিতে হয়। বিদায় মুহূর্তে জননীর হৃদয় ব্যথায় হাহাকার করে ওঠে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কন্যাকে বলেন—

"বৎসরান্তে আসিস্ আবার, ভুলিস্ না মায়, উমা আমার!
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর 'মা' বোল শুনতে পাই।"

দেবী দুর্গার শরৎকালে পিতৃগৃহে আগমনের সঙ্গে বাঙালী মেয়েদের পিতৃগৃহে আগমনের গভীর সাদৃশ্য আছে। আগমনী সঙ্গীত' রচনার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এই সঙ্গীতে বাঙালী মায়ের স্নেহকাতরতা ও কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

শরৎকালে দেবী পূজা আমাদের বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে ছোটবড় সকলের মনেই আনন্দের সাড়া জাগে, প্রবাসী ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়, কন্যা পিতৃগৃহে আগমনের স্বপ্ন দেখে।

মা আসছেন, মা আসছেন এই আনন্দে সকলের প্রাণ বিভোর। মেয়ে আসছে এই আনন্দে মায়ের প্রাণও বিভোর। আনন্দ বিহ্বলতার মধ্যে তাই তো এই আগমনী বাঙালীর হৃদয়ে চিরন্তন আনন্দ প্রবাহ উৎসারিত করে।

আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের এই করুণ মানবিক আবেদন আজও বাঙালীর হৃদয়ে অব্যাহত আছে। এই গানগুলি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। প্রকৃতির লীলাভূমি গ্রাম বাঙলার পথে পথে শরতের শিশিরস্নাত সোনালী সকালে যখন পথিক আপন মনে গেয়ে চলে—

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী।"

তখন কোন না বাঙালী মায়ের কন্যার মুখখানি দেখার জন্য ব্যাকুল হয়?

গ্রাম বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত এই গানগুলির প্রভাব বাঙলার গার্হস্থ্য জীবনে আজও অম্লান রয়েছে।

নাটকের চোখে শতাব্দীর দর্শক

অপন কুমার রায়

২য় বর্ষ ॥ সাম্প্রতিক বাঙলা

দর্শক !

হ্যাঁ,—দর্শকদের কথাই বলছিলাম, সেদিন একজন বিখ্যাত নাট্যসমালোচক কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন যে, "আজকের দিনে রঙ্গমঞ্চে যে যতই অভিনয় করুক না কেন—সবথেকে বড় অভিনেতা কিন্তু দর্শক।" তখনই কথাটার মর্মার্থ বুঝতে আমার কিছুটা সময় লেগেছিল। কিন্তু, পরে যখন বুঝলাম তখন যেন নিজেকে আবিষ্কার ও বিচার করলাম নতুন ভাবে। কারণ এতদিন নাটককেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে এসেছি, দর্শককে নয়, আজকের প্রবন্ধ আমার তাই দর্শকদের নিয়েই—।

পূর্ণাঙ্গ নাটক-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবার আগেই আমরা গীতিপ্রধান আবৃত্তির মধ্যে নাটককে খুঁজে পাই। সুতরাং যে দর্শকরা এই নাটকের রস গ্রহণ করতো তারা যে, শ্রুতিধরও ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি এবং তখন কাব্যের অন্তর্নিহিত বীররস ও করুণরস দর্শকদের চিত্তে অভিনয় তৃপ্তির আস্বাদন দিত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে আদি যুগের কাব্যই নাটকের প্রথম উৎস। প্রথম দিকে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের কালে যে সাহিত্যের পরিচয় পাই, তা যেমন ধর্মীয়ভিত্তিক ছিল। তার পরবর্তী শতাব্দীর নাটকগুলিতেও যে ধর্মের ভিত্তি থাকবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এরপর বাংলা সাহিত্যে মধুর প্রেমরসের জোয়ারে এলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে। সুতরাং আজ দর্শক যখন বর্তমান নাটকগুলির দেহবাদভিত্তির দিকটি আলোচনা করে তখন এই দেহবাদের প্রথম উৎস যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা থেকে উদ্ভূত তা অস্বীকার করতে পারি না। চৈতন্যোত্তর যুগে এই ধর্ম, প্রেম কাব্যের ভিতর যে একটু পরিবর্তন এলো তা আমরা দেখতে পাই আদি লগ্নে চর্যাপদে বুদ্ধনাটকে। এই নাটকটি সম্বন্ধে দর্শকরা এক কথায় ধর্মের রসে আপ্লুত ছিলেন বলা চলে। এরপর পেলাম রামায়ণ-মহাভারতকে আমরা মহাকাব্য-রূপে—Folk Drama বা লোকাভিনয়ও এই সময় প্রচলিত ছিল। "ললিতমাধব"ও "বিদগ্ধ-মাধব" এই নাটকগুলি প্রাচীন সমাজের প্রতিভূ। কিন্তু উক্ত নাটকগুলি সংস্কৃতকে অবলম্বন করে, তাই সংস্কৃত বহির্ভূত খাঁটি বাঙলা নাটক এবং তার দর্শকদের প্রগতি, চিন্তাভাবনার পরিচয় পাই আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে। সব নাটকই অতীত ঐতিহ্য বহন করে চলে, তাই অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর নাটকগুলির ভিতর আমরা ধর্মীয় ভাবের প্রাধান্য দেখি বিশেষ ভাবে।

১৭৪৩ সালে কলিকাতার বুকে "প্লে হাউস" হচ্ছে ইংরাজদের প্রথম রঙ্গালয়। এরপর

এক রুশীয় ভদ্রলোক হেরাসিম লেবেডেফ ১৭৯৫ সালে প্রথম একটি বাংলা নাট্যাভিনয় এর জন্যে রঙ্গালয় তৈরী করেন। এরপর ১৮৩৫ এ নবীন বসুর বাড়িতে এ ১৮৫৮ এবং বেলগাছিয়ার রাজ বাড়িতে, ১৮৭২ এ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও ১৮৭৩ এ বিডন স্ট্রীট এ (বর্তমানের বিডন স্ট্রীট পোস্ট-অফিস) বেঙ্গল থিয়েটার তৈরী করেন শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। বেলগাছিয়া ও শ্যাম-বাজারে "রত্নাবলী" এবং "বিদ্যাসুন্দর" নাটকদ্বয় অভিনয় হয়। এর পরই বাংলায় মৌলিক নাটকের প্রচলন হলো, এবং দর্শক রুচির পরিবর্তনও ঘটলো সেই সঙ্গে। সংস্কৃতের প্রভাবও কমলো।

দর্শক শুধু দেশীয় নাটকের উপর আস্থা না রেখে 'Romeo Juliet' ও 'Marchant Vanice' এর অনুকরণে "ভানুমতীর চিত্ত বিলাস" ও "চারু মুখ চিত্তহরা।" ১৮৫৩ ও ১৮৬৯তে মঞ্চস্থ করলো। দর্শক পরক্ষোভাবে বিদেশী নাটকের চিন্তা চেতনায় প্রবেশ করলো সেই সঙ্গে। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি 'রাম যাত্রা'র আগমন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। তখনকার দর্শকগণ রামের চরিত্রের মহত্ত্ব দেখে ভাবাবেগে আপ্লুত হতো—আবার রাবণের চরিত্রের অভিনয় দেখে বিস্ময়ে, হতবাকও হতেছে। তবে আসল কথা তারা সমালোচক হিসাবে ছিলেন কতখানি? 'না।' সেইসব দর্শকদের আমরা সমালোচক হিসাবে দেখি না। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আজকের দর্শকদের মত তখনকার দর্শকগণ নাটককে চুল-চেরা নিখুঁত বিচার করতে শেখেন নি। এরপর যোগেশচন্দ্র গুপ্তের "কীর্তি বিলাস" (১৮৫২) প্রথম বাংলা সাহিত্যের বিয়োগান্ত নাটক। যদিও দর্শকরা এই নাটকটির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর যোগসাধনের জগাখিচুড়িকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ দর্শককুল এই নাটকটিকে সার্থক নাটক হিসাবে অভিজ্ঞান দিয়েছিলেন। কারণ এই প্রথম নাটকটি সর্বদোষ মুক্ত না হলেও রসত্তীর্ণ হয়েছিল বলা চলে।

প্রথমে কাব্যকেন্দ্রিকতা পরে ধর্মকেন্দ্রিকতা থেকে রুচি বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে এলো সমাজকেন্দ্রিকতা ও প্রহসনে। তাই তৎকালীন "শর্মিষ্ঠা" (১৮৫৯), "পদ্মাবতী" (১৮৬০), ও এর সঙ্গে প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা" (১৮৬০) এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"কে সমাজ সমাদরে বরণ করে নিলো। দর্শক সমালোচনার মানদণ্ডে আরও বলিষ্ঠ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করলো, তাই তখনকার নাটকে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, নাট্যরস, চরিত্র সৃষ্টির মূল্যায়ণ উল্লেখযোগ্য। গোপন প্রেমের প্রকাশ হিসাবে পরক্ষোভাবে মেনে নিল "শর্মিষ্ঠা" নাটকে। "পদ্মাবতী" সম্বন্ধে সমালোচক ও দর্শক সমাজ রায় দিল এটা গ্রীক আখ্যানের ওপর রচিত বলে। নাটকের কমেডি ও ট্রাজেডি ভেদা-ভেদ তত্ত্বকে দর্শক সমাজ চুলচেরা বিচার করতে শুরু করলো। যদিও তখনকার দর্শক আঙ্গিক, উদ্ভট, রূপক এইসব চিন্তায় মাথা ঘাটান নি। কারণ উপরোক্তগুলির উপর কোন নাটক তখনই লেখা হয় নি। ১৫ই আগষ্ট ১৮৭৩-এ বাংলা নাট্য সাহিত্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কারণ ওইদিন ৪ জন মেয়ে (জগত্তারিণি, শ্যামা, এলোকেশী, সুকুমারী দত্ত) নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হলো "শর্মিষ্ঠা"। দর্শকসমাজ

চিন্তায় ভাবনায় বিরাট ভাবে প্রগতির পরিচয় দিয়ে অভিনয় জগৎএ মেয়েদের স্বীকৃতি দিলেন। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, নাট্যকার নাটক রচনা করেন তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে। সুতরাং এই অভিনয় জগৎএ মেয়েদের প্রবেশ নাট্য জগতকে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিল। মধুসূদন নাট্য রচনা করেন মাত্র দুই বৎসর। কিন্তু এই দুই বছরএ বাংলা নাট্যজগৎ এবং দর্শক সমাজ চিন্তায়, ভাবনায় বিরাট ভাবে এগিয়ে গেলেন। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু নাটকই দর্শকগণএর চিন্তা, ভাবনায় সমৃদ্ধ। রামনারায়ণ-এর নাটক "কুলীন-কুল-সর্বস্ব" (১৮৫৪) দেখে দর্শক সমাজ বিদ্যুৎগতিতে নিজেদের প্রসারিত করলেন তর্কের-রস-বিচারের ক্ষেত্রে। বিচার করতে আরম্ভ করলেন নাটককে ভাবের দিক থেকে সেটা সার্থক কিনা। এরপর বেঙ্গল থিয়েটারে এই কি কাজ (১৮৭৩) দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৭৩) মায়াকানন (১৮৭৪) কাদম্বিনী (১৮৭৪) শকুন্তলা (১৮৭৮) হয়ে চলল। ১৮৮০-এ হলো "নীলদর্পণ" দর্শকরা বিপ্লবী চিন্তাচেতনায় পরক্ষোভাবে প্রবেশ করলেন। দিকে দিকে ধ্বনিত হলো, শোষিত মানুষের বাঁচার দাবী। নাট্যকার অত্যাচারীদের মনের সুচেতনাগুলিকে সুপ্ততার থেকে জাগাতে চেষ্টা করলেন। এরপর দীনবন্ধু নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), সধবার একাদশী (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)-কে দিলেন। ১৮৭২-এ যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হয়েছিল সেখানে বহু নাট্যকারের নাটক অভিনীত হলো। দর্শকগণও, ঐতিহাসিক, প্রহসন, সামাজিক ও ভক্তিমূলক নাটক নিয়ে বারবার সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে লাগলেন। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে "সতী" (১৮৭৩), "হরিশ্চন্দ্র" (১৮৮৪), "বিল্বমঙ্গল" (১৮৮৬), "প্রফুল্ল" (১৮৯১), "আলিবাবা" (১৮৯৭), "সিরাজদ্দৌল্লা" (১৯০৬), "নূরজাহান" (১৯০৭), "মেবার পতন" (১৯০৮), "চন্দ্রগুপ্ত" (১৯১৬), "সাজাহান" (১৯১২), "আলমগীর" (১৯২১), ও "নর-নারায়ণ" (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য। এরপর বেঙ্গল থিয়েটার হাত বদল হতে-হতে অরোরা, ন্যাশনাল, থেসপিয়ন টেম্পল, এবং সর্বশেষ "প্রেসিডেন্সি" থিয়েটার হয়ে ১৯১৮ সালে উঠেই গেল। এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা পেল বর্তমানের বিডন স্ট্রীট পোস্ট-অফিস। থিয়েটার জগৎ এরপর রাবীন্দ্রিক নাটকের বিরাট ধাক্কায় সজাগ হয়ে নড়ে-চড়ে বসলো। দর্শক সমাজেএর চিন্তাধারাও নতুন পথে মোড় নিলো। রাজারাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), শোধবোধ (১৯২৬), তপতী (১৯২৯), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), মুক্তধারা (১৯২৫), ও রক্তকরবী (১৯২৬)। এই সমস্ত নাটক দেখে দর্শক সমাজ রূপক, ভাববিলাস ও নাটকের ব্যাঞ্জনাময় দিকটি সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে দিল। রূপক নাটকটি দর্শক মনে ভালভাবে রেখাপাত করলো। এরপর কল্লোল ও কালিকলম এবং অগ্রগতি-এর যুগে বাস্তবতার দিকে বেশী করে নজর দিলো দর্শকগণ। রাবীন্দ্রিক নাটকের ধাক্কায় দর্শককুল সজাগ হলেও চাকা ঘুরছে সজোরে তাই বিদেশী নাটকের অনুবাদও হয়ে চলল—ইউজিন ও' নীলের "মরণিং-বি-কামস ইলেকট্রা", গোটের "ফাউষ্ট", ইবসেনের "ঘোষ্ট". গোর্কীর "মা" বা সেক্সপীয়ারের "হ্যামলেট" বা "ওথেলো।"

কিন্তু দর্শক সমাজ চিন্তাচেতনায়, ভাবনায় প্রচণ্ডগতিতে এগোচ্ছে; বর্তমানে শোষিত মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করছে, তাই আজকের প্রতিটি নাটকে বিপ্লব এর প্রকাশ দেখতে পাই। বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, প্রতিটি নাটকেও "অজের ভিয়েৎনাম", "শৃঙ্খল", "কল্লোল", প্রবাহ, "রক্তগোলাপ" ইত্যাদির ভিতরে। তবে বর্তমান নাটকে বিপ্লবীচিন্তাচেতনা সম্বন্ধে এরা খুবই সজাগ, কারণ আজকের দর্শক বিপ্লবের সাফল্যের কথায় কথায় মনে রাখে উত্তর ভিয়েৎনামকে আর ব্যর্থতার কথা ভাবলেই তারা বেছে নেয় ইন্দোনেশিয়াকে। দর্শকসমাজই এখন বিপ্লবী নাটক সম্বন্ধে তাই এত সজাগ। তারই মধ্যে এসেছে নাটকে আর একটি নতুন চিন্তাধারা সেটা হলো "এবসার্ড নাটক" বা "উদ্ভট নাটক", আমাদের প্রগতীবাদী দর্শকরা এই উদ্ভট নাটককেও সমাদরে গ্রহণ করেছে। তারও প্রচণ্ড সমালোচনা করছে, বিশ্লেষণ করছে ভারী সুন্দর ভাবে।

এর মধ্যের আমরা "রাজা ওয়েদিপাউস", "শের আফগান", "মৃত দেহ", তিন "পয়সার পালা"। "নাটাকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র", "যখন একা", "শেষ বিচার", "বৃষ্টি-বৃষ্টি", "এবং ইন্দ্রজিৎ", "পাগলা ঘোড়াকে" পেলাম। তখন যে ভাবে দর্শক সমাজকে নাটকের রূপক আঙ্গিক, প্রয়োগ, চিন্তা, ভাবনা করতে দেখি তাতে সত্যিই অবাক না হয়ে পারিনা। তাই নিঃস শতাব্দীর মাঝখান থেকে এর মধ্যে যে প্রগতি দর্শক সমাজের হয়েছে তাতে গর্ব বোধহয়। এখন পাঠক প্রশ্ন করবেন "সবই তো বুঝিলাম বাপু। কিন্তু তুমি যে এই দর্শকদের সম্বন্ধে এত কথা লিখিলে তাহা জানিলে, কি প্রকারে?" আমি বলবো যে-একবার তৎকালীন সমাজ ও নাটকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝবেন যে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সমাজের দর্শকদের রুচি, পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই এই সব নাটক গড়ে উঠেছে। কারণ—এটা ধ্রুব সত্য যে নাটকের চিন্তা—ভাবনা নির্ভর করে নাটকের বিষয় বস্তুর ওপর। তাই এখন যদি কেউ বলেন যে—"সমঝদার দর্শক" কোথায়? তখন মনে হয় যে আজকের দর্শকদের প্রগতি সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ অথবা এই দর্শকদের তারা স্বীকৃতি দিতে চাননা। তাই দর্শক প্রগতি আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক। আরও বিপ্লবী নাটক আসুক এই আশানিয়ে আজকের বক্তব্য শেষ করলাম।

জীবন ও সাহিত্য

শিবপ্রসাদ মিত্র

তৃতীয় বর্ষ । কলা

জীবন এবং সাহিত্য—এ দুটিই পরস্পর অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। এদের কোন একটাকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা অন্তিত্ব আমরা কল্পনাও করতে পারি না। জীবনের চলার পথে সাহিত্য আমাদের প্রতিনিয়ত দেয় প্রেরণা। গতি ও শক্তি। আর সাহিত্যে আমরা পাই জীবনেরই বিচিত্র স্পন্দন, বিচিত্র অনুভূতি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

জীবন যে কী, তা' এক কথায় বোঝানো বড় শক্ত। বিভিন্ন মনীষী জীবনের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তবে জীবন যে একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, বোধ করি, সে বিষয়ে অনেকেই একমত। এই সংগ্রাম আমাদের প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদের এই সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যেদিন থামবে, জীবনও সেইদিন গতিহারা হবে।

দৈনন্দিন জীবনে নিরন্তর আমরা সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা মিলন বিরহের লীলা করে চলছি। সুখে আমরা প্রাণখুলে হাসি, মিলনে লাভ করি পরম আনন্দ; আর দুঃখে আমরা চোখের জল ঝরাই, বিরহে হই বড় কাতর। সাহিত্যশিল্পী কিন্তু এই বিচিত্র জীবন-লীলা তার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রচনা করেন অপূর্ব সাহিত্য রসের মধুচক্র।

সাহিত্যে আমাদের কিছু বাড়তি পাওনা থাকে। তা' আর কিছুই নয়, শিল্পীর আপন হৃদয়ের সেই স্নিগ্ধ-প্রশান্ত মাধুরী। দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও সাহিত্যিক তাঁর আপন হৃদয়-রসে জারিয়ে যখন উপহার দেন তাঁর সাহিত্য-প্রতিমা, তখন তা আমাদের কাছে পরম রমনীয় ও বরনীয় হয়ে দেখা দেয়। তাই সাহিত্য-শিল্পীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই কিছু বেশী আর আদর্শ শিল্পী সে-প্রত্যাশা পূরণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করারই প্রয়াসী।

কোন মানুষই তার নিজস্ব যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। কোন-না-কোনভাবে তিনি তার যুগের শিকার হতে বাধ্য। সাহিত্যিকও কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁকে যুগোপযোগী কিছু লিখতেই হয়। যুগের দাবী মেটাতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এইভাবে, জীবন যখন যন্ত্রণাকাতর, সাহিত্যে তখন যন্ত্রণাহত মানুষের সকরুণ আর্তনাদেই আমরা শুনি। জীবনে যখন অমানিশার অন্ধকার, সাহিত্যে তখন পূর্ণিমার আলোক-প্লাবন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব।

সাহিত্য জীবনের প্রতিফলিত রূপ। দৈনন্দিন জীবনের বহু বিচিত্র রূপই নানারকমে, নানা

রসে, নানাগন্ধে সাহিত্য আকারপ্রাপ্ত হয়। এককথায় সাহিত্য হচ্ছে জীবনের দর্পণ, দর্শনে আমরা যেমন আমাদের বাহ্যিকরূপ প্রত্যক্ষ করি তেমনি সাহিত্য-দর্পণে জীবনের আন্তরিক রূপেরই প্রতিফলন ঘটে।

সাহিত্য কিন্তু বাস্তবের অনুলিপি মাত্র নয়। সাহিত্যের সত্য সত্য ও বাস্তবের সত্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। বরঞ্চ বলা চলে যে, সাহিত্যের সত্য আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর। অতীত এবং বর্তমানে ঘটনাপ্রবাহের আঙ্কিক রূপ দিলেই তা' সাহিত্য হয়ে ওঠে না, কারণ, সাহিত্য নিছক ঘটনার ঘনঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তাই যদি হোত, তবে সংবাদপত্রে আর সাহিত্য-পত্রে কোনই প্রভেদ থাকত না। তাই সাহিত্যিকের কাছে আমরা শুধুই ঘটনা প্রত্যাশা করি না, করি আরও কিছু। তাই শিল্পী সযত্নে ও সুকৌশলে এই ঘটনাপ্রবাহের ওপর বুলিয়ে দেন সাহিত্যরসের প্রলেপ আর তখনই তা আমাদের কাছে পরম উপভোগ্য ও আদরণীয় হয়ে ওঠে। একথা স্মরণযোগ্য যে অতিবাস্তবতার চাপে সাহিত্যের মাধুর্য নষ্ট হয়।

সাহিত্যের কাজ কিন্তু অনেক। জীবনের পথ-পরিক্রমণকালে বিবিধ প্রতিকূলতার চাপে আমাদের স্বাভাবিক গতি-শক্তি ব্যাহত হয়। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-পাঠে সেই গতিশক্তি আমরা ফিরে পাই। বহুবিধ বঞ্চনা ও হতাশার গ্লানিমা যখন আমাদের হৃদয়-প্রদেশ সমাচ্ছন্ন করে, তখন সেই গ্লানিমার অপসারণ একমাত্র সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই সম্ভব, প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন সাহিত্যের, "প্রধানতম কাজ হোচ্ছে মানুষকে নিদ্রার জাল থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে ক্রমশঃ জাগরূক করে তোলা।" তাই সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়।

সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্নটি কিন্তু সর্বকালিক ও সর্বস্থানিক। তাই আমাদের সাহিত্যেও এই জাতীয় সমস্যার পূর্বেও দেখা গেছে এবং এখনও এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। বর্তমানে আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার যে ভয়াবহ নগ্নরূপ ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করছে তাতে এই সাহিত্যের ভবিষ্যত আদৌ আশাবহ মনে হোচ্ছে না। তবে কি এটাই ধরে নেওয়া সমীচীন হবে যে, আমাদের জীবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেছে এই সর্বনাশ আধুনিকতা। তাই সমস্ত সাহিত্য-রসিকদের আজ কিন্তু ভাববার সময় এসেছে সাহিত্য-তরীর এই নিমজ্জমান অবস্থা সম্পর্কে। আসুন, আমরা সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হই। কারণ, সাহিত্য আমাদেরই— সমস্যাটাও আমাদের।

সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতি সমীক্ষা

তারক কুমার দে

তৃতীয় বর্ষ। বাণিজ্য

টাকার অঙ্কে যখন মানুষের আয় বৃদ্ধি পায় অথচ উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ে না, তখন পণ্যমূল্যের সাধারণ দাম-স্তর অর্থাৎ প্রত্যেক পণ্যের দামই অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পায়। এইরূপ মূল্যবৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি যে বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা বিশ্বের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বুঝিতে পারি। প্রথমতঃ যুদ্ধের সময় কেন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে? এর কারণ হয়ত আমাদের অনেকেরই জানা। এই অবস্থায় সরকার সৈন্যবিভাগে প্রচুর লোক নিয়োগ করে ফলে অধিক পণ্য ক্রয় করিতে হয় ও লোকের আয়ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে উৎপাদন আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি পায় না। ইহার ফলে মুদ্রার পরিমাণ জনগণের হাতে বেশী হয় ও মূল্যস্তর বাড়ে। এইজন্য ইহাকে যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে, সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 'সিকিউরিটি' বা নিরাপত্তা দিয়া যদি ঋণ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া ঐ ঋণ দেয় এবং সরকার যদি রাস্তাঘাট রেলপথ নির্মাণের জন্য ঐ অর্থ ব্যবহার করে তখন জনগণের টাকার অঙ্কে আয় বৃদ্ধি পায় এর ফলে সাধারণ মূল্যস্তরের উর্ধগতি হয়। এইরূপ মুদ্রাস্ফীতিকে ঘাটতি ব্যয় জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

আবার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ যদি সুদের হার কমাইয়া অধিক হারে ঋণ দিতে থাকে, তখন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিনিময় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে ঘটে মুদ্রাস্ফীতি। কারণ লোকেরা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া বেতন ইত্যাদির কাজে ঐ অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন না বাড়ায় মূল্যস্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ মুদ্রাস্ফীতিকে "Credit Inflation" বলা হয়।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কোন প্রকারেই হউক না কেন লোকের টাকার অঙ্কে আয় বৃদ্ধি পাইতেছে ঠিকই; কিন্তু উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি না পাওয়াই হইল মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম মূল কারণ। ইহার পাশাপাশি অবশ্য কতকগুলি পরোক্ষ কারণও আমাদের চোখে পড়ে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে :

প্রথমতঃ মূল্যস্তর যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন ব্যবসায়ী মধ্যে এই ধারনার সৃষ্টি হয় যে মূল্যস্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিনিয়োগ প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিনিয়োগকারীরা যখনই কাঁচামাল ক্রয় করিতে আরম্ভ করে তখনই কাঁচামালের মজুতদারেরা মাল বিক্রয় সঙ্কুচিত করে এবং কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। ইহার ফলে

কালোবাজারীর আবির্ভাব ঘটে এবং কাঁচামালের দাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহা মূল্য বৃদ্ধির একটি পরোক্ষ কারণ। তাই নজরুলের বাণীতেও আমরা সেই ইঙ্গিত দেখিতে পাই—

"অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য যে গেল চলে
বীরের মতন মরণ কারারে চরণের তলে দ'লে।"

অপরপক্ষে মূলধনী সামগ্রীর উৎপাদনে যখন বিনিয়োগ শুরু হইতে থাকে, তখন শ্রমিকের আয়-বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে বৃদ্ধি হয় না। কাজেই ভোগ্যপণ্যের দাম খুব দ্রুত বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মুদ্রাস্ফীতি জনিত মূল্যবৃদ্ধির দুইপ্রকার কারণ একটি প্রত্যক্ষ ও অপরটি পরোক্ষ করেন।

প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের কোন উপায় নাই। কারণ নিরোধ করিবার জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহার ফলে বাজারে মন্দা আসে। উৎপাদনকারীরা আর উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করিতে আগ্রহশীল হয় না। শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ছাটাই করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। লোকের টাকার অঙ্কে আয় কমিয়া যায়। পণ্যের চাহিদা কমিয়া যায়। ফলে উৎপাদন হ্রাস হয় এবং বাজারে এক সঙ্কটময় অবস্থার উৎপত্তি হয়, যাহাকে বলা হয় "Crisis" বা চরমক্ষণ। তাই নজরুলের ভাষায়:

"চীৎকারে তার উঠবে কেঁপে
ধরার সাগর অশ্রু ছেপে
উঠবে ক্ষেপে অগ্নিগিরি সেই পাগলের হুহুঙ্কারে,
সুখর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণি নেচে ঘিরবে তারে।"

কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে যুদ্ধের সময় পণ্যের দাম যে পরিমান বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার পরে আজ ত্রিশবছর অতীত হইতে চলিল কিন্তু কোন পণ্যের দামই হ্রাস পায় নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তথাপি শিল্পের চাকা ঘুরিতেছে; মানুষ না খাইয়া মরিতেছে, না পরন্তু বলা যায় যে, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের অবস্থা ভালর দিকে গিয়াছে, জীবন যাত্রার মান উন্নত হইয়াছে শিক্ষার প্রসারও ঘটিয়াছে। ইহার কারণটি এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহার কারণও মুদ্রাস্ফীতি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় প্রায় ১২০০ কোটী টাকার কাগজী মুদ্রা দ্বারা সরকার গঠনমূলক কাজের একটি বিশেষ অংশ সম্পাদনা করিয়াছেন। অবশ্য কাগজী মুদ্রা ছাড়াও অন্যান্যভাবে ৩৬০০ কোটী টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল এবং প্রায় সমস্তটাই ব্যয় করা হইয়াছে। কাজেই আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথা স্বীকার করা যায়—মুদ্রাস্ফীতি যে ক্ষতিকারক একথা সব সময় ঠিক নহে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিলেই যে সব সমস্যার সমাধান হইবে তাহাও ঠিক নহে। তাই বিষয়টি বিচার করিতে হইবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিক হইতে। যে দেশে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে, বেকার শ্রমিক রহিয়াছে সেই দেশ

যদি দ্রুত উন্নতি করিতে চায়, তবে মুদ্রাস্ফীতিই তাহার সহজতম পথ। রবীন্দ্রনাথ এজন্যই 'সমবায়'—২ প্রবন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিয়াছেন : 'অর্থ উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তা হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত।" (সমবায়নীতি—১৯২ পৃষ্ঠা)।

স্বামী বিবেকানন্দ

রামচন্দ্র মাইতি

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ কলা

ভারতের নিরন্তন নিয়ম—এই দেশ ও জাতির সংকটলগ্নে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। ইঁহারা দেশ ও জাতিকে জ্ঞান ও সত্যের আলোক দেখাইয়া থাকেন। সেই সত্যের আলোকে জাতি জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হয় এবং দেশ সকল বাধামুক্ত হয়। তাঁহারা শতাব্দীর ধূমকেতু নন—ধ্রুবতারা বিশেষ। প্রসঙ্গতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে ভারত যখন দ্বিধাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত তখন কলিকাতা মহানগরীতে নবীন ভারতের অন্যতম স্রষ্টা বীরকেশরী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন। বাল্যের নাম নরেন্দ্রনাথ। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সিমলার দত্তপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত আইন ব্যবসায়ী, উদারহৃদয় ও সঙ্গীতসেবী ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরীদেবী ধর্মপরায়ণা ও সংসারধর্ম সচেষ্টা ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ স্বচ্ছল পরিবারে মানুষ হইতেছিলেন। শৈশব হইতেই পিতামাতার মুখে পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের যৌবনে সংসার ত্যাগের কাহিনী শুনিতেন। পরিণত বয়সে পিতামহের আত্মত্যাগের বুদ্ধি তাঁহার অন্তরকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার জীবনধারার গতি সবদিক দিয়া বিপরীতমুখী হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, দেশের ও দশের স্বার্থে আত্ম-স্বার্থত্যাগ এবং জীবনের সকলক্ষেত্রে সত্যের অনুসন্ধিৎসা তাঁহার কর্মজীবনের ব্রতরূপে প্রকাশিত হয়। ছাত্রজীবনের উত্তরকালে অধিক জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় বিদ্যাচর্চা শুরু করেন। বিদ্যাচর্চার আকর্ষণে জগতের মূল সত্যকে জানিবার ইচ্ছা তাঁহার মণিকোঠায় উঁকি দেয়। জীবন-জিজ্ঞাসায় তৎকালীন বিভিন্ন মনীষী, গুরুবৃন্দ ও জ্ঞানী-গুণীর সহিত তাঁহার সান্নিধ্য ঘটে। সকলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান সূচক প্রতিদান দিতে পারেন নাই। আকাঙ্খা অতৃপ্ত অবস্থায় বিবেকানন্দের মনমন্দিরে অবিরাম দোলা দেয়।

এই সময় বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করেন। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব বিবেকানন্দের স্কন্ধে অর্পিত হয়। সংসার কল্পনাতীত অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় বিবেকানন্দের জীবনের গতি উভয়সংকটের মুখে তরণীবৎ স্থির হইয়া আসে। সংসার ও সাধনা এই দুইয়ের চাপে বিবেকানন্দ দিশাহারা হইয়া যান। কিন্তু দৈহিকগঠন অনুসারে যিনি উজ্জ্বল চক্ষু, প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, ব্যায়াম পটুদেহ ও অটলোন্নতশির, তিনি স্বভাবত লোকনেতৃত্বের প্রতীক ও সর্বসৌভাগ্যযুক্ত ব্যক্তি। তাই সকল বাধা বিপত্তি তাঁহার গতিপথে তৃণের মত নিষ্পেষিত হইল।

স্বদেশের কল্যাণসাধন তাঁহার শৈশবের কল্পনা ছিল। তাই তিনি সেই কল্পনাকে বাস্তবরূপায়ণে কৃতসংকল্প হইলেন। দিশাহারা পথে দক্ষিণেশ্বরের এক অদৃষ্টপূর্ব ব্রাহ্মণের সাহচর্যে বিবেকানন্দের চোখে আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সেই ব্রাহ্মণের অভিজ্ঞতা এমন অসাধারণ ছিল, যাহা শুনিলে অশ্রুত শ্রুতমান হয়, যাহা চিন্তা করিলে বাঙ্ময় চিন্তায় উপস্থাপিত হয়। এবং যাহাকে জানিলে অজানা বিষয়ও জানা যায়। এই অসাধারণ ব্রাহ্মণ সহজেই বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়েন। এই ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবেকানন্দ তাঁহার বহু আকাঙ্খিত জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজিয়া পান ও সেই ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই অসাধারণ জ্ঞান ও গুণের অধিকারী সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন পরমপুরুষ ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

গুরুদেব রামকৃষ্ণদেবের অপার করুণায় বিবেকানন্দ উভয়সংকটের পথে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, তাই একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"বিপদে প্রলোভনে ভগবান রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—সান্ত্বনা পাই নাই, কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অন্তর্যামীর মত আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া সকলই অপহৃত করিয়াছেন। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে বিবেকানন্দ সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া, আর্তপীড়িত পদদলিত অগণিত জনসাধারণের সেবার ভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন। সেবক তথা পরিব্রাজকরূপে তিনি সারাভারত পরিভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে তিনি দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ও অবমাননার স্বরূপ দর্শন করেন এবং প্রতিকারের উপায় চিন্তা করেন। সুদীর্ঘ চিন্তার অবকাশে তাঁহার অন্তরে এই সত্য মূর্ত হয় যে, ভারত আধ্যাত্মিক জগতে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সামাজিক উন্নতির পরিমাপ সেই তুলনায় নিম্নমানের। তাঁহার মতে "আমাদের পূর্ব পুরুষদের আত্মার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু আমাদের তাহা নাই। তাই এই অনগ্রসরতা দৃষ্ট হইতেছে।" এই অবস্থায় দেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতিকল্পে দেশের অভ্যন্তরে একটা মিশন স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয়। আর্থিক সঙ্গতি ছিল না এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে সাহায্যের ইঙ্গিত ও ছিল না—তবু সাহসে ভর করিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, মিশন প্রতিষ্ঠার সময় ভারত হইতে যে অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, বিদেশের দান সেই তুলনায় অনেক বেশী ছিল।

শেষপর্যন্ত মিশন স্থাপনের কার্য সমাধা হয়। গুরুদেব রামকৃষ্ণদেবের নামানুসারে এই এই মিশনের নামকরণ করা হয়: "রামকৃষ্ণ মিশন।" এইভাবে বিবেকানন্দের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভারতের সামাজিক কল্যাণের উপায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ভারতের নবীন ভাবধারা বহির্ভারতে ও বিস্তারের জন্য পদসঞ্চার করে।

বহির্ভারতে আমাদের আত্মবিস্তারের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। একসময় তিনি বলিতেন, "ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয় তবে তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য জাহির করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে অবিচারিতভাবে ছড়াইয়া দিতে

হইবে—বিস্তারই জীবন, সংকোচই মৃত্যু।" স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে রাজা রামমোহন ভারতের ভাবধারা বিশ্বের দ্বারে প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই প্রচারকার্য প্রসারলাভ করে নাই।

পরবর্তীকালে বীরেশ্বর বিবেকানন্দ সেই অসমাপ্ত কল্যাণকর্ম সমাধানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিধি প্রসন্ন ছিলেন। তাই ভারতের ভাবধারাকে বহির্বিশ্বে বিস্তৃত করিবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে বিবেকানন্দের দৃষ্টিগোচর হয়।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে এক আন্তর্জাতিক ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশের প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন। শিষ্যদের অনুরোধে এবং ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করেন। বলা যায় বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াও তিনি এই বিরাট ধর্মীয় সম্মেলনে ভারতের সনাতন বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সভাস্থলে ভাষণের প্রারম্ভে: "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ।" তাঁহার মুখের এই অভূতপূর্ব সম্বোধন শুনিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ বিস্মিত হইয়া উঠেন। তারপর স্বামীজী উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "হিন্দুধর্ম যুগে যুগে সর্বধর্মের হইয়া সকল কথা শুনিয়াছে। কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই। হিন্দুধর্ম সকলধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। ভারতের কোটি কোটী নর-নারী প্রতিদিন শিবমহিম্নস্তোত্র পাঠ করে—"। (অবশ্য) "ভিন্ন ভিন্ন রুচিহেতু সরল কুটীল নানাপথে গমন করেন। হে ভগবান তুমি উহাদের রক্ষা কর। তুমিই একমাত্র স্বাস্থান।"

সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা ও ধর্ম উন্মাদনার ফলে যে, হিংসা, দ্বেষ পৃথিবীকে যুগে যুগে মানুষের রক্তে রঞ্জিত করিয়া আসিতেছে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে স্বামীজী চিরকালের জন্য জগত হইতে তাহার অবসান ঘোষণা করিলেন, সেইসঙ্গে ব্যাখ্যা করিলেন তাঁহার পরমগুরু পরমহংসের বাণী—"যতমত তত্তপথ" একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তের মতানুসারেই সর্ব ধর্মের ব্যাখ্যা সম্ভব। ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার এই সকল অমরবাণী শুনিয়া আমেরিকার দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ওই ক্ষণে বিশ্বের দরবারে ভারতের অমৃতবাণী অভিনন্দিত হইয়াছিল। বলা যায়, স্বামীজী আপন কর্মপ্রচেষ্টায় জাতির কর্মশক্তির আদর্শ বিদেশে নিবেদন করিয়া ভারতকে সম্মানের উচ্চাসনে পূর্ণ মহিমায় মধ্যে গগনে উদ্ভাসিত করেন।

আগতিক হিংসা ও স্বার্থান্ধ সংঘাতের লক্ষ্য করিয়া শান্তির জন্য স্বামীজী অদ্বৈতবাদের ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে "কেবল অদ্বৈত ভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে সমান দেখিতে পায়, আমাদের বিশ্বাস, উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানবগোষ্ঠীর ধর্ম। সৎশাস্ত্র বিহিত সদাচারের বিরোধ এবং একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়া তাঁহার বিচারে আর্য জাতির পতনের কারণ, এবং 'ধর্মদিকে নহে, ধর্ম হুজুগে নহে" ধর্মের মতামত লইয়া মাথা ঘামানো সকলের উচিত নহে। "বীর কখনও পাপ করিতে পারেনা। কাপুরুষেরা পাপ করিয়া থাকে। সাহসী ও সরলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ হইয়া থাকেন।"

ধর্ম ও নীতি বিষয়ে স্বামীজীর একাধিক উপদেশ অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণযোগ্য (১) "সাধুতা ও শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস। (২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব। (৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎকাজ করিতে সচেষ্ট তাহাদিগকে সহায়তা করা।"

এইসকল উপদেশামৃত বর্ষণের পর স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নানা প্রকার গঠন ও প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী যুগে শতশত আত্মত্যাগী যুবক স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

স্বামীজীর কর্মমুখর জীবনে আর একটি বিশেষ সামাজিক অসম্পূর্ণতা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। স্ত্রীজাতির কল্যাণসাধন। তিনি বলিতেন, "জগতের কল্যাণে স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে দেশের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। স্মরণ করা যাইতে পারে—১৮৯৪ সালে আমেরিকা হইতে শিবানন্দ স্বামীকে জানাইয়াছিলেন—"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবেনা। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা (ভারতে) সেখানে ব'লে। (এইবার) মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সে মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, এইজন্য তাঁহার মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই·····শক্তির কৃপা নাহ'লে কি ছাই হবে।" অচিরেই স্বামীজীর অন্তর্নিহিত ভাবকল্পনার সমাধান সূচিত হয়। আইরিশদুহিতা মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল স্বামীজীর আত্মিকচেতনা এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা অবগত হইয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরমাসে স্বামীজীর প্রচারিত ধর্মীয়জগতে আত্মনিবেদন করেন। ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম তাঁহার অন্তরকে প্রভাবিত করে। শেষপর্যন্ত আইরিশ দুহিতা ভারতদুহিতায় রূপান্তরিত হন। মিস্ নোবেল একাধারে শিক্ষিকা ও সমাজসেবিকা ছিলেন। স্বভাবতই ভারতের অবহেলিত নারী সমাজকে নূতন ছকে গড়িবার জন্য বিবেকানন্দের মুখনিসৃত বাণীবস্তুরূপে মিস্ নোবেল ভারতে নারীশিক্ষার কার্যে ব্রতী হন। বলাবাহুল্য, স্বামীজীর উৎসাহ উদ্দীপনায় তিনি ভারতে বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে নারী শিক্ষার জন্য একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কালক্রমে ভারতে নারী-শিক্ষার চেতনা বিকশিত হয়। মিস্ নোবেল ভারতজনের কাছে ভারতবান্ধবীরূপে পরিচিতা হন। ইনিই উত্তরকালে ভারতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা। এইরূপে শক্তির পূজার্চনায় স্বামীজীর সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটে। অন্তরের সকল কামনা বাসনার অবসান হয়।

স্বামীজী দেশপরিক্রমায় বাহির হন। লণ্ডন, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি পরিভ্রমণ করিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতমায়ের স্নিগ্ধ স্নেহাঞ্চলছায়ে চিরতরে নিদ্রাভিভূত হন। স্বামীজীর এই অকালমৃত্যুতে দেশ তথা জাতির যে কি অভাবনীয় ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বর্তমানের এই হিংসা উন্মত্ত দেশ ও জাতির ইতিহাসে অনুধাবন করিলেই উপলব্ধি করা যায়।

দেশ ও জাতির সংকটলগ্নে আবির্ভূত এই মহাপুরুষ ৪০ বৎসরের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষয়কীর্তিগাথা ভারতীয় জনজীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাহার

কারণ জন্ম হউক যথা তথা কর্ম হউক ভাল। সরল নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই মনুষ্যত্ব বিচার্য, জন্মস্থল গৌন প্রতিপন্ন হয়। কারণ নিচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ অধ্যবসায় এবং কর্মপ্রচেষ্টায় দশজনের একজন হইতে পারিলেই মহানুভবতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হইয়া থাকে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বহুবিধ বাধা বিপদের সম্মুখীন হইয়াও বিবেকানন্দ আপন অভীষ্ট কর্মপ্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন। তাই আজও বাংলা তথা ভারত এবং বহির্ভারতেও বিবেকানন্দের মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইতেছে।

মানুষ চুনিল যবে নিজ মর্তসীমা

বিমানকুমার রায়চৌধুরী

প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান

আকাশে নীরব রাতের লক্ষ তারকা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই নিমন্ত্রনেই লোক হতে লোকান্তরে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে নক্ষত্র হতে নক্ষত্রান্তরে মানুষের যাত্রা। শূন্যমণ্ডলে ভাসমান শরীরদের আমাদের সবচেয়ে নিকটতম চন্দ্র, তার নির্মল শুভ্র বিকিরণে মানুষের সব মলিনতা দূর করে সঞ্জীবন সুধায় সঞ্জীবিত করে হয়েচে প্রিয় থেকে প্রিয়তর। কত স্বপ্ন, কত কল্পনা চাঁদকে ঘিরে, কখনও ক্ষুধার রাজ্যে 'চাঁদ হয়েছে বলসানো রুটি'। তাকে নিবিড় করে পেতে জানতে দেখতে. বুঝতে মানুষ সর্বদাই আগ্রহী, বিজ্ঞানের সাহচার্যে তাই সে যন্ত্রী হয়ে পাড়ি দিচ্ছে চাঁদের বুকে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে বিজ্ঞানের ক্রমতকর্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে চাঁদে পাড়ি দিতে আর তাই সে আকর্ষিত হচ্ছে চন্দ্রের নানা ইশারায় নানা ইঙ্গিতে।

মানুষের এই চন্দ্রাভিযান হয়েছে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনিময়ের একটি তীর্থকেন্দ্র। এদিক থেকে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির ভিতর রাশিয়া এবং আমেরিকার অবদান এবং চন্দ্রাভিযানের সফলতার অন্তরালে এই দুই দেশের দান অকপটে অনস্বিকার্য। এই দুই কৃতী বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্রবিজয়ের মানসে মহাকাশযাত্রাও তার গতিকে আধুনিক থেকে আধুনিকতম করতে দৃঢ়সংকল্প এই প্রচেষ্টার প্রথম প্রয়াসে সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক নামক স্বয়ং চাঁদেতে মহাকাশযানকে মহাশূন্যে পাঠান। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা আবার ১৯৫৯ সালে পৃথিবী হতে ২৫০৬১২ মাইল দূরবর্তী চাঁদে পারমাণবিক ষ্টেশন স্থাপনে সচেষ্ট হন। এরপর তাঁরা আরও একটি শক্তিশালী কৃত্রিম উপগ্রহ চাঁদের কক্ষপথকে প্রদক্ষিণ করে ফেরার পথে নিয়ে আসে চন্দ্র পৃষ্ঠের বহুশক্তিশালী দূরবীক্ষণ ক্যামেরা দিয়ে তোলা কতগুলি সুস্পষ্ট ছবি। আবার এই ছবির উপর ভিত্তি করে চলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং শুধরে নেওয়া হয় পরবর্তী দোষ ত্রুটিগুলিকে। এরপর চলে উন্নতধরনের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চলে মানুষকে চাঁদে পাঠাবার আয়োজনে।

এইভাবে কাটল কিছুদিন। সোভিয়েট রাশিয়া তৈরী হচ্ছিল। আমেরিকা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন মহাকাশযানে যাবার যাত্রীদের। সকল সাধারণ মানুষের মহাকাশযানে যাওয়া সম্ভব নয় বলে, প্রথমে সাহসী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও ধীর স্থির ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া হয়। তারপর এদের চলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা……। আবার মহাশূন্যের আবহাওয়া ন্যায়

পরিবেশিত স্থানে পদসঞ্চালন দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা, অর্থাৎ এতে পরীক্ষিত ঐ ব্যক্তি কতটা কষ্টসহিষ্ণু ইত্যাদি……। তারপর ঘূর্ণীর ভেতরে ঐ ব্যক্তিকে মহাকাশে যাবার পোষাকে বসিয়ে ঐ ঘূর্ণীটিকে মিনিটে ৩০০ বার ঘুরিয়ে ঐ ব্যক্তি Heard breathing pulse reading blosd preoswe আর পরীক্ষা করা হয় লোকটি কতটা ক্লান্ত। এরপরও ঐ ব্যক্তিকে একটি Heat proof chember বসিয়ে chember-এর বাইরে থেকে chemberটিকে 900°c—1200°c তাপে উত্তপ্ত করার পর পরীক্ষা চলে ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, মুখ-মণ্ডলের বিশেষ করে চক্ষুর বিশেষ পরীক্ষা। এই সমস্ত পরীক্ষা করার পর উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের মহাকাশ যাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত করা হয়। তারপর আরম্ভ হয় মহাকাশযানে চড়ার প্রশিক্ষণ অর্থাৎ কেমন করে মহাকাশযান চালনা করতে হয়। 'Otomatic Eletronic rain দ্বারা চালিত মহাকাশযান বিকল হলে, কি করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়……ইত্যাদি আরও কত কি……?

এরপর আসে রাশিয়ার কঠিন পরীক্ষা। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মানুষের আর একটি দুঃসাহসিক অভিযানের উল্লেখযোগ্য দিন। বিশ্বের প্রথম মানুষ সোভিয়েট রাশিয়ার যুবি গাগারিণ ভোস্তক ১ নং মহাকাশযান চড়ে চন্দ্র বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপে গেলেন মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষপথে। মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বাইকোনুর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তখন প্রবল উত্তেজনাকর পরিবেশ। সমস্ত বিশ্ব তার সেরা কৃতী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তখন টেলিভিশনের পর্দায়; মহাউৎকর্ষ শব্দতরঙ্গ কি সংবাদ বহন করবে এবং বায়ুতরঙ্গ কি সংবাদ পরিবেশন করবে! কয়েকটি নীরব মুহূর্ত……। তারপর মহাশূন্য হতে গাগারিণের ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শোনামাত্র নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বিজয় বার্তার উল্লাসে ফেটে পড়ল। সফলতার জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতির বিজয় মুকুট আপন শীরোদেশে ধারণ করে, গাগারিণ বিজয়ীর সম্মানে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর আমেরিকা প্রথম কেপকেনেডির মহাকাশযান যন্ত্র থেকে ১৯৬১ সালের ৫ই মে এবং ২১শে জুলাই যথাক্রমে নভশ্চরদ্বয় সেপারর্ড ও গ্রিসনকে মহাকাশযানে মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠিয়ে সাফল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে আনেন। এরপর সোভিয়েট রাশিয়া চন্দ্রাভিযানের পদক্ষেপকে একধাপ এগিয়ে ১৯৬২ সালের ১১ই আগষ্ট ভস্তক-৩এ করে নভশ্চর নিকলায়েভকে মহাশূণ্যে পাঠান। রাশিয়ার এই অভিযানে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণমান নভশ্চর নিকলায়েভই প্রথম টেলিভিশন মারফত চাঁদের ছবি পাঠান। এরপরই ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুন রাশিয়ান ললনা ভ্যালেন্তিনা তেরোস্কভাকে ভস্তক-৬কে মহাশূন্যে পাঠিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন নজির সৃষ্টি করেন। বিশ্বের তিনিই একমাত্র মহিলা নভশ্চরী, তাঁর পূর্বে ও নয়ই এবং এখনও পর্যন্ত আর কোন মহিলা নভশ্চর মহাকাশযান চড়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেয়নি। সোভিয়েট রাশিয়াই প্রথম ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ভোস্তক-১এ তিনজন নভশ্চর ফেওটিসটভ, কোমারভ, ও ইয়েগোরভকে একই মহাকাশযানে মহাশূন্যে পাঠান, এরপর ১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ ভোস্তক-২এ চড়ে নভশ্চর বেলায়েভ, লিয়নভ, কোমরভ এই

তিনজন পৃথিবীর কক্ষপথে পাড়ি দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃথিবীতে প্রত্যাগমনকালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় মহাকাশযান ধ্বংস হয় এবং কোমারভ্ নিহত হন, এর-ফলে রাশিয়ার চন্দ্রাভিযানের প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়।

আবার এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ৩রা জুন আমেরিকা জেমিনি-৪এ করে নভশ্চর ম্যাকডিভিট হোয়াইটকে শূন্যে পাঠান এবং এই অভিযানের কার্যসূচী অনুযায়ী হোয়াইট ২১ মিনিট মহাশূন্যে পদচারণা করেন। আর কিছুদিনের মধ্যে ১৯৬৫র ১৫ই ডিসেম্বর জেমিনি-৬এর নভশ্চরেরা কয়েক দিন আগে উৎক্ষেপিত জেমিনী এর সঙ্গে মিলনের প্রয়াসে পরস্পর পরস্পরের একফুটের মধ্যে আসে। আমেরিকার এই ডকিং প্রচেষ্টা চাঁদের বুকে পা রাখার ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে রাশিয়া মহাশূন্যে সাফল্যের সঙ্গে ১৯৬৮ সালে ২৮ অক্টোবর সোয়ুজ—৩এর নভশ্চর বেরেগোভর পূর্বে পাঠান মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান সোয়ুজ ২এর মিলন ঘটান। রাশিয়ার এই সফল প্রচেষ্ট চন্দ্রাভিযানে মানুষের চাঁদে নামার ক্ষেত্রে দৃঢ়তম পদক্ষেপ। এইভাবে সোভিয়েট রাশিয়াও আমেরিকা একে অপরের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে আধুনিক থেকে আধুনিকতম বিজ্ঞানের সাহায্যে চন্দ্রবিজয়ে সচেষ্ট হন।

১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর এ্যাপোলো-৮ চড়ে বোরম্যান, লোভেল ও এনডেরস্ নভশ্চর-এর সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের ৭০ মাইলের মধ্যে গিয়ে নানা তথ্য ও চিত্র পাঠান এবং আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে oxygen শূন্য ধূ-ধূ ধূসর বালিরাশী ও শিলাখণ্ড ছাড়া কোন প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করলেন না। পরবর্তীকালে চাঁদের আরও কাছে যাবার জন্য, চাঁদে নামার ভেলা নিয়ে নভশ্চর ইঁয়ং, স্ট্যাফোর্ড ও সারজেন ১৯৬৯ সালের ১৮ই এ্যাপোলো-১০ আমেরিকার কেপকেনেডির মহাকাশযান বন্দর থেকে পাড়ি দিলেন। এবং কক্ষপথকে অতিক্রম করে শক্তিশালী রকেট চালু করে চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে সারজন চাঁদের ভেলা চেপে চান্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯-৪ মাইলের মধ্যে এসে চাঁদ সম্বন্ধে আরও তথ্য ও মানুষের চাঁদে নামার স্থানটিকে চিহ্নিত করে আসেন। তারপর আসে মানুষের জীবন ও বিজ্ঞান জগতে এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত।

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই এ্যাপোলো-১১-এ করে আমেরিকার নভশ্চর নীল আর্মষ্ট্রং, কলিনস ও অলড্রিন গেলেন চন্দ্রবিজয়ে। পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী রকেট চালু করে নভশ্চরেরা প্রবেশ করলেন চাঁদের অভিকর্ষের মধ্যে। মূল মহাকাশযান থেকে আর্মষ্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদের ভেলা ঈগলকে নিয়ে চললেন চাঁদের দিকে। কলিনস্ চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ১১১ মাইল ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। তারপর অনন্ত মুহূর্ত। এবার চাঁদের ভেলা ঈগল থেকে নভশ্চরদের নামতে হবে। হিউসটনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নির্দিষ্ট সময়ের নির্দেশিত পথে ঈগল চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করল। তারপর ধীর পদক্ষেপে চাঁদের পৃষ্ঠে পা ফেললেন নীল আর্মষ্ট্রং আর তাঁকে অনুসরণ

করলেন এলড্রিন। স্থাপনা করলেন সকল দেশের জাতীয় পতাকা, সূচিত হল বিজ্ঞান ইতিহাসের নব অধ্যায়। ধ্বনিত হল মানুষের বিজয় বৈজয়ন্তী। ফেরার পথে নভশ্চরেরা আনলেন কিছু নুড়ি, রেখে এলেন আমেরিকার বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এই নুড়ি পাথর নিয়ে পৃথিবীতে আরম্ভ হল ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, চলল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চাঁদ মানুষের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান কিনা, চাঁদ কিভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায় ইত্যাদি···। এরপর আমেরিকা চাঁদের পথে মানুষ পাঠাল। রাশিয়া চন্দ্রাভিযানের দীর্ঘতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের ৬ই জুন ২৪ দিনের জন্য সোয়ুজ-১১-এ করে ঘবরোভলসকি, ভলকভ, ও পাতসায়েভ এই তিনজন মহাকাশচারীকে চন্দ্রাভিযানে পাঠাল। কর্মসূচী অনুযায়ী ১২ই এপ্রিল পাঠানো স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান গবেষণাগার-স্যালুটের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধার জন্য নভশ্চরেরা চেষ্টা করেন এবং চাঁদ সম্বন্ধীয় আরও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ও চিত্রাদি পাঠান। কর্মসূচী অনুযায়ী সব ঠিকই চলছিলো কিন্তু শেষের কাজ সারার আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময়ে মহাকাশযানে ছিদ্র হওয়ায় তাঁরা মহাকাশযানের মধ্যেই প্রাণ হারান। তাঁদের নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে সোয়ুজ-১১ নেমে এল! নভশ্চর-এর এই সাফল্যে যখন তাদের বীরচিত সম্মানের আয়োজন চলছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁদের অকাল মৃত্যুতে পৃথিবীর বিজ্ঞান ইতিহাসে নেমে এলো বিষাদের ছায়া। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে এই নভশ্চরদের পৃথিবীর কক্ষপথে "Space Station" স্থাপনের চেষ্টা সহজে চন্দ্রে অবতরণের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মানব ইতিহাসে বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক অভিযানের সংকল্প নিয়ে আমেরিকার তিন মহাকাশ-চারী স্কট, আরউইন ও ওয়াবডেন ২৬শে জুলাই এ্যাপোলো-১৫ চড়ে চাঁদের দিকে রওনা হন। রকেট সমেত এই মহাকাশযানের উচ্চতা প্রায় ২৬ তলা বাড়ির মত। স্যাটন রকেট ওপরে রাখা মূল মহাকাশযানটি প্রায় ৮ তলা বাড়ির মত। আধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত এই বিশাল দেহে রকেটে অগ্নিসংযোগ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার গতিতে নিমেষের মধ্যে মহাশূন্যের অন্তরালে অন্তর্নিহিত হল অজানার উদ্যানে।

চাঁদে তারা নেমে আধুনিক সম্মত বিজ্ঞানের নির্মিত জীপ গাড়িতে ঘুরে বেড়ান এবং এই অভিযানের তাঁরা সবচেয়ে বেশী সময়ের জন্য চাঁদের মাটিতে থেকে রেকর্ড করেন। এছাড়াও তাঁরা ব্যাটারি চালিত ড্রিলের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠ খনন করে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন ফুটের মধ্যে একটি কঠিন জমাট শিলাস্তর আবিষ্কার করেন এবং এমন কতগুলি নুড়ি পাথর পান যা চন্দ্রের সৃষ্টির সমসময়ের বলে অনুমান করা হচ্ছে। এরপর তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে ৮ই আগষ্ট পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের ভারতবর্ষ মহাশূন্য গবেষণায়ও চন্দ্রাভিযানে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও ১৫ই আগষ্ট অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে প্রথম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করে। বিজ্ঞান মানুষের জীবনে কতটা সাফল্য আনতে পারে, মানুষের চন্দ্রবিজয় তার একটি জাজ্বল্য উদাহরণ। পৃথিবী থেকে ২৫০৩১২ মাইল দূরবর্তী চাঁদের পৃষ্ঠে বিচরণকারী নভশ্চরদের গতি, মানসিক অবস্থা, দেহের রক্তের চাপ, পদচালনা ইত্যাদির ছবি

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিভিশনের পর্দার ওপর ফুটে ওঠে। কোন কাজ যদি নির্ধারিত কর্মসূচীর ও সময়সূচীর মাফিক না হলে এবং যন্ত্রের কোন দোষত্রুটি ধরা পড়লে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের বিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্দেশিত মহাকাশযানের যোতাম টিপে নভশ্চরেরা ত্রুটিগুলি আরোপিত হত।

সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা যৌথ প্রচেষ্টায় মানুষ অসাধ্য সাধন করেছে চন্দ্র বিজয় করে। পৃথিবীতে হিংসা, বিদ্বেষ, রোষ, বিভেদ, জোরজুলুম-সর্বোপরি জনসংখ্যা যেভাবে দিন দিন বাড়ছে, তাতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হতে চলেছে। রাশিয়া, আমেরিকার সেই কৃতী বিজ্ঞানীরা যাঁরা ধ্বংস কাণ্ডারীর মত ঝড়, তুফান, বন্যার ন্যায় শান্তি হননকারীদের উপেক্ষা করে যদি বিজ্ঞান সৌরভের সঞ্জীবন সুধায় শান্তির অমৃত ধারা বর্ষণ করে, আর শান্তির সেই অমৃত প্রাণরস ধারায় সঞ্জীবীত হয়ে, অতীতের সব হিংসা রোষ, বিভেদ, বিদ্বেষ, দুঃখ সব ভুলে গিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে পারে ভাই, বন্ধু, পরমাত্মীয় বলে ; তখনই মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের এখানে সেই চিরন্তন উক্তিটি :

"স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
জগতের এত ধণ !
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?"

ভারতীয় ক্রীড়ামান নিম্নাভিমুখী কেন ?

অজিত কুমার রায়
দ্বিতীয় বর্ষ। বাণিজ্য শাখা

সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা বিরাজমান। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে আজ সব কিছু আবর্তিত হইতেছে। কেহই পরিত্রাণ পাইতেছে না, ক্রীড়াক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি।

শৃঙ্খলাহীন ক্রীড়ামান আজ নিম্নাভিমুখী। কিন্তু কেন? বর্তমানে সমস্ত ক্রীড়ামান নিম্নাভিমুখী? এই ক্রীড়া জগতের বিশেষ একটি বিষয়ে আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে ফুটবলের একটি বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে।

"ফুটবল"—একটি বিচিত্র রস এর আকর্ষণে। সবাই উত্তাল হইয়া পড়েন এবং এই ফুটবলের মধ্যে কত রং, কত রূপ এবং কত বিচিত্র সম্ভার ছড়াইয়া আছে।

ভারতের ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র এই কলিকাতা মহানগরী। এই ফুটবলকে কেন্দ্র করিয়া কত উত্তেজনা এবং উন্মাদনা এই বিশাল মহানগরীর প্রতিটি ফুটবল রসিকের মধ্যে গড়িয়া ওঠে।

এই উত্তেজনা উন্মাদনা এবং আকর্ষণ শুধু বাংলা দেশ কিংবা ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ইহার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিরাজমান।

এই ফুটবলের অঙ্গনে এত রূপ বলিয়া, বর্তমানে ক্রীড়াজগতে রূপ-রংয়ের আসরে—"রাজার" স্থান দখল করিয়া আছে, "এই ফুটবল"। কিন্তু এই আসরের "রাজা" ফুটবলের যান এত অবনতির দিকে কেন? ইহা বর্তমানে প্রতিটি মানুষকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষে ফুটবলের এইরূপ হাল হইল কেন?

কে—বা কাহাদের অদৃশ্য হস্ত আজ এই ফুটবলের মানকে আরোও নিম্নাভিমুখী ঠেলিয়া দিতেছে? তাহাই সকলের নিকট একমাত্র জিজ্ঞাস্য! কিন্তু প্রতিটি ক্রীড়ারসিক যদি আজ তাহাদের বিবেক বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া সুস্থমস্তিষ্কে একটু বিচার করিয়া দেখেন তাহা হইলে তাহারা খুব সহজে ইহার কারণগুলি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রথমতঃ এই অবনতির কারণ হিসাবে প্রধানভাবে দায়ী করা যায়, ফুটবল-পরিচালন সংস্থার কর্মকর্তাদের এবং কলিকাতা মহানগরীর কতিপয় নামী দামী ক্লাবকে (মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিংএর ন্যায় আরোও অন্যান্য ক্লাব)।

দ্বিতীয়তঃ শুধু তাহাই নহে, বর্তমান ফুটবলকে লইয়া এই সকল কর্মকর্তাগণ ব্যবসা করিতেছেন, পরিষ্কার ভাবে বলিতে কোন দ্বিধা নাই যে, ইহাকে লইয়া জুয়া খেলা চালাইয়াছেন। ফুটবলকে লইয়া কর্মকর্তাগণ যাহা করিতেছেন, তাহা সত্যই দুঃখজনক।

তৃতীয়তঃ আমরা আরোও ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিব যে কলিকাতার বড় বড় ক্লাব বাহির হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বহু নামী দামী খেলোয়াড় আমদানি করিয়া থাকেন। আমার মতে ক্লাবগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল দলগত শক্তি বৃদ্ধি করা এবং ভারতীয় ফুটবল সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সমস্ত "ট্রফি" নিজ দখলে রাখা।

কিন্তু এই নামী দামী খেলোয়াড় সংগ্রহের ফল কি? তাহা কি কর্মকর্তাগণ একবারের জন্য ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন?—আমার মনে হয় না।

প্রতি বৎসর বাঙলা দেশে প্রচুর খেলোয়াড় তৈয়ারী হইতেছে, কিন্তু তাহারা প্রকৃত সুযোগের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সকল খেলোয়াড়েরা উক্ত বড় বড় ক্লাবগুলিতে খেলিবার সুযোগ না পাওটাই খুব স্বাভাবিক কারণ, সেই সব বড় বড় ক্লাবগুলিতে সব নামী দামী খেলোয়াড়ের দ্বারা পরিপূর্ণ। এবং কর্মকর্তাগণ ও এই সকল খেলোয়াড় দ্বারা সমস্ত ট্রফি জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন। তাহারা কি করিয়া এই ভারতবর্ষের ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর উঠতি খেলোয়াড়দের কথা ভাবেন? তা ছাড়া ভাবিবার সময় কোথায়!

সুতরাং এই সকল উঠতি খেলোয়াড়েরা বড় বড় ক্লাবে তো সুযোগ পানই না! তাহার উপরে তো আবার আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুযোগ তো সুদূর পরাহত। সত্যি কথা বলিতে কি আমাদের দেশে কোন সত্যের বিচার নাই।

আমাদের দেশের খেলাধুলা সংস্থার নিয়ম কি জানেন? যাঁহাদের সেই সব সংস্থার বড় বড় মাথা রহিয়াছেন এবং যাহারা বেশ ভালভাবে কর্মকর্তাদের পায়ে তৈলমর্দন করিতে পারিবেন তাহারাই আন্তর্জাতিক আসরে প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পাইবেন।—আমি বলি, কিন্তু কেন?

কেবলমাত্র কর্মকর্তাদের দূরদর্শিতা এবং স্বার্থের মনোভাবের দরুণ এই সকল স্থানীয় খেলোয়াড়েরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ের ন্যায় ভাল হইয়াও সুযোগ পান না। ইহা ছাড়া আরোও একটি বড় জিনিষ হইল, যাহা কেবলমাত্র ফুটবলের জন্যই নহে যাহা সমস্ত খেলাধুলার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন উহা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ইহা আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। কারণ বিশ্বের প্রতিটি দেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এবং ঐ প্রশিক্ষণ ৩/৪ বৎসর অবধি চলিতে থাকে।

কিন্তু আমাদের দেশে ৩/৪ বৎসর তো দূরের কথা ১৫/২০ দিন হয় কিনা সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ অনুশীলনের প্রয়োজন বোধ করেন না, তাহারা অনুশীলন ব্যতীত বিশ্বজয়ের আকাশ কুসুম কল্পনা করিয়া থাকেন।

পঞ্চমতঃ হইল আমাদের দেশে উপযুক্ত মাঠের অভাব। আজ অবধি একটি ষ্টেডিয়াম গড়িয়া তুলিতে কর্মকর্তাগণ সক্ষম হইলেন না। কিন্তু এই ষ্টেডিয়াম গঠন সম্পর্কে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া চলিয়াছেন এমন কি এই ষ্টেডিয়াম তৈয়ারীর জন্য যে বিপুল পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহা যে কি অবস্থায় মধ্যে রহিয়াছে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

ষষ্ঠতঃ আমাদের ক্রীড়াবিশারদগণ নিজেদের মান সম্বন্ধে বিরাট ধারণা পোষণ করেন

এবং তাহারা প্রতিটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

একটি উদাহরণ দ্বারা তাহাদের এই ক্ষোপরদালালী সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। ভারতীয় হকি দল কোন একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে অনুশীলনে যোগদান করিয়াছিল। এবং ভারতীয় হকি দলকে শিক্ষা দিবার জন্য একজন খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড়কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তিনি খেলোয়াড়দের নানা কলাকৌশল শিখাইতেছিলেন।

এমন সময় একজন কর্মকর্তা আসিয়া শিক্ষককে বলিলেন যে তিনি, ভুল শিখাইতেছেন। ইহাতে শিক্ষক খুবই মর্মাহত হইলেন। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত কর্মকর্তা মহাশয় হকির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এই সকল কারণেই ভারতীয় দলগুলির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষকের অভাব ঘটিয়াছে।

আমাদের দেশে ক্রিকেটের অবস্থা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দলগত সংহতির অভাবের দরুণ একমাত্র হকি ব্যতীত সর্বক্ষেত্রেই এই চরম অসাফল্য। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের খেলাধূলার মানকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম এই দুর্নীতিকারী কর্মকর্তাদের যত শীঘ্র সম্ভব বিতাড়িত করিতে হইবে এবং উপযুক্ত অনুশীলন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার পূর্বে প্রয়োজন একটি স্টেডিয়ামের। স্থানীয় খেলোয়াড়দের সুযোগ দিতে হইবে। এবং অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রতিটি খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে হইবে। পরিশেষে এই বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কোন কাজ করা সম্ভব নহে। এই উন্নতির জন্য প্রয়োজন খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা দান তাহাদের আত্মবিকাশে সহায়তা দান। কিন্তু আমাদের দেশে সে সুযোগ কই? খেলাধূলার জন্য প্রয়োজন নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় এবং মনোযোগ ও একাগ্রতা। সেইজন্য প্রয়োজন খেলোয়াড়দের সংসারের দায়িত্ব মুক্ত করিয়া খেলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সরকারের উচিত। সরকারের ঔদাসীন্যে দিন দিন খেলার মান আরো নিচে নামিয়া যাইবে। সুতরাং এই অক্ষম প্রতিরোধের ব্যবস্থা বিলম্বে দেশের খেলাধূলার ক্ষেত্রে অন্ধকার নামিয়া আসিবে।

ভারতীয় ফুটবল ঃ মারডেকা সমীক্ষা

আবিনাথ ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ। দাম্মানিক বাণিজ্য

১৯৭১-এর মারডেকা ভারতের কলঙ্ক!

ইংল্যাণ্ডের ম্যাচটিতে ভারতের বাবার লাভ ভারতের পক্ষে, প্রতিটি ভারতবাসীর পক্ষেও খুবই আনন্দের এবং গৌরবের কথা। সে আনন্দ প্রত্যেকটি ভারতীয় যথাযথভাবে উপভোগ করছে কিন্তু সেই আনন্দের জোয়ারের মধ্যে হয়ত মারডেকায় ভারতের দশম স্থানের খবরকে চাপা পড়তে হয়েছিল। ক্রিকেটের সাফল্যের পাশে ফুটবলের শোচনীয় ব্যর্থতা মানায় না। '৭০-এর মারডেকায় তৃতীয় স্থানাধিকারী ও এশিয়ার গেমসের ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারী ভারতীয় ফুটবল দলের বার্মার হাতে ৯—১ গোলে পরাজিত হওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর এবং প্রতিটি ভারতীয়র পক্ষে গ্লানিকর। একজন সামান্য ফুটবল খেলোয়াড় ও ফুটবলপ্রেমিক হিসেবে, অন্য সব ভারতীয় ফুটবলপ্রেমিকের মত এই পরাজয় আমাকেও মর্মে মর্মে আঘাত করেছে।

জানি না, কেন এই পরাজয়! অন্য সকলের মত আমারও এই একই প্রশ্ন : কেন এই পরাজয়? আমরা মারডেকা ফুটবলে হেরেছি। কিন্তু তার কয়েক দিন পরেই পেস্তা সুকান প্রতিযোগিতায় যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল। তাই ভারতীয় দলের পরাজয়ের কারণ নির্ণয় করা আমার কাজ নয়। প্রয়োজনও নেই, শুধু এই কথাটুকুই জানাতে চাই যে, এই ফুটবলকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে অনেকগুলি টুর্নামেণ্ট খোলা হয় এবং অনেক নামী দামী খেলোয়াড়কেও খেলতে দেখা যায়, ফুটবল অনুরাগীর অভাবও নেই। এর পেছনে খরচা যথেষ্ট না হলে ত কিছু করা হয়। প্রতি International Game-এ যোগ দেওয়ার আগে বহু পয়সা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়, তবুও ভারতীয় ফুটবল দল আজ বিদেশে দেশের মুখ রক্ষা করতে পারে না, পারে না আর অন্য সকল দেশের মত ফুটবলে বেশ শক্তিশালী দল হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে।

ভারতের ফুটবলে মান ক্রমশই নিম্নমুখী। আগে ভারত অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় প্রতিবারই পৌঁছত। একবার প্রবীণ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে মেলবোর্নেও ওঠার সৌভাগ্যও ভারতের হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুটবলে উন্নতি করতে না পারায় ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ভারত ইরাণের কাছে পরাজিত হয়ে মূল প্রতিযোগিতায় পৌঁছতে পারে নি। এক সময় ভারত ছিল এশিয়ান গেমসের ফুটবল

চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু এখন অর্থাৎ ১৯৭০-এর এশিয়ান গেমসে ভারতের মিলেছে ব্রোঞ্জপদক। কিন্তু এর কারণ কি?

ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিশ্বের অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের চেয়ে দৈহিক শক্তিতে কম সে কথা মানা যায়, কিন্তু ক্রীড়াকৌশলে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা অন্য দেশের খেলোয়াড়দের সমতুল্য না হলেও খুব নিম্নস্তরের নয়। প্রমাণ পূর্বের ছকির বর্ণপদক। তবে কি এই নিম্নমুখী মানের দলগত সংহতির অভাব হতে পারে। কারণ ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিভিন্ন ক্লাবেও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের। সুতরাং একত্রে খেলবার সুযোগও তাঁদের হয়না। তাই কোন বিদেশী প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার আগে বেশ অনেকদিন ধরে একত্রে 'Practice' করা যুক্তিযুক্ত এবং যে দেশে খেলা হবে সেই দেশে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য বেশ কিছুদিন আগে থাকতে সেই দেশে গিয়ে 'Practice' করলে ভাল। আবহাওয়াজনিত সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। এছাড়া টিমগঠন ও 'ভাল হওয়া দরকার' তরুণদের ওপর জোর দিয়ে টিম গড়লে, খেলার মান নিশ্চয় উন্নত হবে, ক্রিকেটই এর বড় নজীর।

আগামী '৭৪' সালের বিশ্বকাপে ভারতের যোগদান অনেকের কাছে হয়ত হাসির খোরাক হয়েছে। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু ভারতীয় ফুটবল দলের উচিত নিজেদের শক্তি সামর্থ ও দলগত সংহতির ওপর নির্ভর ক'রে খেলা। যাতে মারডেকার ৯—১ গোলের পুনরাবৃত্তি না হয়। যাতে ভারতীয় দলকে আর একবার পৃথিবীর মাঝে উপহাস্যাস্পদ হতে না হয়। যাতে "কাদা মাঠ তাই খেলতে পারিনি" এইরকম অজুহাত আর না দিতে হয়; কারণ এই রকম অজুহাত মোটেই টেঁকে না। যে দলের অনেকগুলি খেলোয়াড় পশ্চিমবাংলার এবং যেখানে ফুটবলের সিজনে প্রায়ই বৃষ্টি হয়ে মাঠ সেখানে রীতিমত পিচ্ছিল এবং সর্বোপরি বর্ষাকালে ইডেনে ফুটবল খেলতে হয়, তখন কি খেলোয়াড়রা অভ্যস্ত নন্? আর খেলোয়াড় আহত হবার অজুহাতটাও অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ নামী দামী খেলোয়াড়রা আহত হলে সেই দলের পক্ষে ম্যাচে সাফল্যলাভ সম্ভব নাও হতে পারে। তবে International Game-এ আহত খেলোয়াড় নামিয়ে '১' গোল খাবার চেয়ে দল না নামিয়ে প্রতিপক্ষকে "ওয়াক ওভার" দেওয়া হয়ত এর চেয়ে সম্মানের কথা হতো। যাই হোক, সামান্য একজন খেলোয়াড় ছাত্র হিসেবে আমার এসব কথা বলা হয়ত উচিত নয় কারণ এসব বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য অনেক বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ লোক আছেন। এটা শুধু একজন ফুটবলপ্রেমিক হিসাবে আমার হতাশার অভিব্যক্তি!

তবে এবার থেকে আশা রাখব যে, আগামী বছরগুলিতে ভারতীয় ফুটবল দল অনেক ভালো খেলা প্রদর্শন করবেন, ফুটবলের মান আরও উন্নত করবেন, ফুটবলে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং আমাদের তমসাময় মনে নতুন আশার সূর্যবীজ বপন করবেন।

ভারতের 'রাবার' বিজয়

শম্ভুনারায়ণ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বর্ষ। সাম্মানিক বাণিজ্য

উনিশ শ' একাত্তর সাল ভারতীয় খেলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। একই বছরের মধ্যে পৃথিবীতে ক্রিকেট খ্যাতিমান ও শক্তিমান দুই দেশ—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং ইংলণ্ডের কাছ থেকে ভারতের 'রাবার' বিজয় ভারতীয় তথা পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন নজীর সৃষ্টির এক শুভ সূচনা করল।

এ বছরের প্রথম দিকে অর্থাৎ শীতের মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়েছিল। এই সফরের প্রাক্কালেই ভারতীয় ক্রিকেট দলকে কিছুটা বদবদল করা হয়েছিল এবং তখনি সর্বসম্মতিক্রমে দলের অধিনায়করূপে অজিত লক্ষ্মণ ওয়াড়েকরকে মনোনীত করা হয় এবং এই অজিত ওয়াড়েকরের নেতৃত্বেই প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম 'রাবার' জয়ের সম্মান লাভ করে। এই 'রাবার' বিজয়টি ভারতীয় ক্রিকেট শুরুত্ব খুবই বেশী; কারণ এই জয়লাভের ফলে ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের মনে প্রবল আস্থা ও আশার সূত্রপাত করে। ফলস্বরূপ আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় 'রাবার' বিজয়কে।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের 'রাবার' বিজয় অবশ্য প্রথম নয়। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে এই 'রাবার' বিজয়কে প্রথম বলা যায়! উনিশ শ' বারট্টি সালে আমাদের দেশে ইংলণ্ডের কাছ থেকে আমরা প্রথম 'রাবার' জয়ের সম্মান লাভ করি কিন্তু বিদেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডের মাটিতে 'রাবার' বিজয় এই প্রথম! কাজেই এর শুরুত্ব খুবই বেশী। এর আগে ইংলণ্ডের মাটিতে একুশটি টেস্ট খেলা হয়েছিল তার মধ্যে কোন টেস্টেই আমরা জয়লাভ করতে পারিনি। অবশ্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে 'রাবার' জয় স্বতন্ত্র।

ভারত ইংলণ্ডের মাটিতে তিনটি টেস্ট খেলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হয় যথাক্রমে লর্ডস এবং ওল্ড ট্রাফোর্ডে। এদুটি টেস্টে ভারতীয় দলের জয় পরাজয়ের লক্ষণ দুই লক্ষিত হয় কিন্তু অবশেষে টেস্ট দুটি অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হয়। তৃতীয় টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয় ওভালে। এই টেস্টেই আমরা ইংলণ্ডকে চার উইকেটে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ের সম্মান লাভ করি। এই জয়ের মধ্যেও বহা-অনিশ্চয়তা ছিল। কেহই ভাবতে পারেনি যে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে একাত্তর রানে এগিয়ে থেকে ও দ্বিতীয় দিনের খেলা বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত

হওয়া সত্ত্বেও পৌনে চার ঘণ্টা সময় হাতে রেখে ভারত জয়ের তিলক পরবে। ইংলণ্ড এবার সর্বশক্তি নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ছিল; কেননা ওরা জানত এবারের ভারতীয় দল সাধারণ নয়, কিছুদিন আগে ওরা ক্রিকেট জগতে খ্যাতিমান ও শক্তিমান দেশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে 'রাবার' লাভ করেছে, কিন্তু ইংলণ্ডও সর্বশক্তি নিয়োগ করেও আমাদের তরুণ খেলওয়াড়দের দুর্বার গতিকে রুখতে পারেনি। ভারতের কাছে এই পরাজয়ের আগে ইংলণ্ড ছিল ক্রিকেটে বেসরকারী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান। ক্রিকেট অবশ্য সরকারী ভাবে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান আখ্যা নেই কিন্তু ছয়টি দেশ—ইংলণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড, ভারত পাকিস্থান-এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী আসরে যে দেশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সেই দেশকেই বে-সরকারী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমান ইংলণ্ডের হাতে আছে চারটি 'রবার'। সে দেশগুলি হল: অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্তান। আর নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংলণ্ডের কাছ থেকে ভারতও চারটি 'রাবার' লাভের সম্মান অর্জন করেছে। কাজেই এদিক দিয়ে ভারতকে এখন বে-সরকারী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান বলা যেতে পারে।

এবছরের শীত ও গ্রীষ্মের দুটি ক্রিকেট মরশুমে দুই শক্তিশালী দলের কাছ থেকে 'রাবার' ছিনিয়ে আনাই শুধু নয় এছাড়াও আমরা কয়েকটি সুন্দর 'রেকর্ড'-ও সৃষ্টি করতে পেরেছি তাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে সর্বপ্রথম 'ফলোঅন' করতে পেরেছি, ইংলণ্ডকে সবচেয়ে কম (একশ' এক) রাণে ইনিংস শেষ করাতেও বাধ্য করেছি এবং একটি কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে পাঁচশোরও বেশী রান করতে পেরেছি। এছাড়া কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ খেলাতেই আমরা সাফল্য লাভ করেছি। অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থের নেতৃত্বে ইংলণ্ড এই প্রথম যে দেশের কাছে পরাজয় স্বীকার করল—সে দেশই হল ভারত। আমাদের এই জয়ের মূলে তারুণ্য শক্তি আর দলগত সংহতির সংমিশ্রণ ত আছেই, তাছাড়া আছে আমাদের নব অধিনায়ক অজিত লক্ষ্মণ ওয়াডেকর এর দৃঢ়তা ও সুদক্ষ নৈপুণ্যতা। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের পরই কথা উঠেছিল ব্যর্থ ব্যাটসম্যান অশোক মানকড় ও সারদেশাইয়ের বদলে জয়ন্তীলাল এবং আব্বাস আলী বেগকে দলে নেবার জন্যে। চন্দ্রশেখরের বদলে দলে আসবেন এরাপল্লী প্রসন্ন। ওল্ড ট্রাফোর্ডে চন্দ্রশেখর একটিও উইকেট পাননি। সারদেশাই, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যিনি 'ডবল সেঞ্চুরী' করে সুনাম অর্জন করেছিলেন; তিনিও প্রথম দুই টেস্টে চার ইনিংসে মাত্র তিপ্পান্ন রাণ করেছেন। কিন্তু এটাই'ত অধিনায়ক ওয়াড়েকর এর কৃতিত্ব যে, ওভালের মাঠে ওরা সফল হবেন, কাজেই কাউকে অদল বদল না করে একই দল নিয়ে ওভালের মাঠে নামলেন ওয়াড়েকর। ওই চন্দ্রশেখরের বলের যাদু এবং সারদেশাইয়ের ব্যাটের দৃঢ়তা জয়ের মুখ্য কারণ হলেও মানকড়ের যে অবদান নেই তা একেবারেই বলা যায় না। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ওলিভেরার এবং দ্বিতীয় ইনিংসে আণ্ডারউডের ক্যাচ ধরেছেন অশোক মানকড়। এছাড়া এঞ্জিনিয়ার, বিশ্বনাথ, সৈয়দকার আবিদ আলী, ভেঙ্কটরাঘবন কারো অবদানই কম

নয়। সবচেয়ে বড় অবদান ভগবৎ চন্দ্রশেখরের—যিনি ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্ত করে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র আটত্রিশ রানে ছয়টি উইকেট পেয়েছেন এবং তাঁরই প্রভাবে ইংলণ্ড সবচেয়ে কম (একশ' এক) রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়েছে।

অনেকে বলেন লর্ডস এবং ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্ট জয়ের মুখে এসেও ইংলণ্ড বঞ্চিত হয়েছে বৃষ্টির জন্যে—লর্ডস টেস্টে শেষ দিনের চা পানের বিরতির সময় ভারতের ছিল দু'টি উইকেট তখন খেলা পরিত্যক্ত হয় বৃষ্টির জন্যে। চা-পানের পর খেলা আর অনুষ্ঠিত হ'তে পারে নি। ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে ঐ একই কারণে। তখন ভারতীয় দলের জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল তিনশ পঞ্চাশ রান এবং হাতে ছিল সাতটি উইকেট—আমি কিন্তু এই মতবাদের বিশ্বাসী নই ; কেননা কে জানত যে ভারত দু' উইকেটে আটত্রিশ রান করতে পারত না এবং দ্বিতীয় টেস্টে ভারত সাত উইকেটে তিনশ পঞ্চাশ রান করতে না পারলেও 'ড্র' করার মত অনেক সুযোগও ছিল। ক্রিকেট খেলার শেষমুহূর্ত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কারুর কোন মন্তব্য করা আদৌ সমীচীন নয় ; এটাই ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হল : তৃতীয় টেস্ট খেলা। এটা 'গৌরবময় অনিশ্চয়তাও' বটে !

ওভাল টেস্টের প্রথম দিন ইংলণ্ড তিনশ পঞ্চাশ রানে ইনিংস শেষ করে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ থাকে এবং তৃতীয় দিন ভারত সাত উইকেটে দু'শ চৌত্রিশ রান করে। একদিন বিরতির পর খেলায় নাটকীয় পরিবর্তন। কারণ এক দিনে পনেরোটি উইকেটের পতন হল। ভারত দু'শো চুরাশি রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করলে তখন ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের চেয়ে একান্তর রানে পিছিয়ে ছিল। তারপর আরম্ভ হল চন্দ্রশেখরের বোলিং। চন্দ্রশেখরের বোলিং-এর স্রোতে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের দৌড় থেমে গেল একশ' এক রানে। তখন সবার মুখে একই প্রশ্ন : "ভারত এই টেস্টে জয়লাভ করতে পারবে ত ?" অবশেষে ভারতের জয়লাভই সুনিশ্চিত হল।

দিনের শেষে ভারত দুই উইকেটে ছিয়াত্তর রান তোলে। তখনও জয়ের জন্যে ভারতের প্রয়োজন মাত্র সাতানব্বই রান, হাতে আটটি উইকেট এবং সময় পুরো একদিন।

শেষের দিনের ঘটনা খুবই ছোট্ট এবং সংক্ষিপ্ত। লাঞ্চের পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবিদ আলীর হাতে ভারতের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের 'বাউনডারি স্ট্রোক'। ফলে ভারত চার উইকেটে জয়লাভ করল। এদিকে সারা ভারতে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। এতক্ষণ যারা অর্থাৎ ক্রিকেটপ্রেমিকরা বেতারে আগ্রহে খেলার ধারাবিবরণী শুনছিলেন তারা আবিদ আলীর জয়সূচক 'বাউনডারি' মারার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে হর্ষধ্বনি দিতে লাগলেন এবং পটকা বাজি প্রভৃতি ফাটিয়ে আনন্দ প্রকাশে মেতে উঠলেন।

বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষ—ভারতবাসীর কি চিরস্থায়ী বন্ধু ?

শ্যামলেন্দু হালদার

প্রাক্তন ছাত্র। বাণিজ্য শাখা

ভারতের এক বিপুল অংশে অগণিত মানুষের ওপর প্রতিবছরই আসে বন্যার বিধ্বংসী আক্রমণ—গত বছরে ও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। দুঃস্থ, দুর্গত মানুষগুলো তাদের শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হচ্ছেন। '৬৭ এবং ৬৮ সালের মেদিনীপুর—অন্ধ্র-প্রদেশের বন্যা, '৬৯ সালের উত্তর-বঙ্গ ও আসামের বন্যার প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির ঘা শুকোতে না শুকোতেই এসেছে '৭০ সালের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের বন্যা। এবারের বন্যায় হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, নদীয়া ও কলকাতার প্রায় দেড়কোটি লোক খাদ্যহীন-বস্ত্রহীন, গৃহহীন হয়েছেন। ফসল সমেত কত কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিহারের মন্ত্রী আই, পি, সাহী ও অন্য আর তিনজন মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে জানা যায় মজঃফরপুর ও দারভাঙ্গা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এমন ভাবে প্লাবিত হয়েছে যে তার কবলে পড়েছেন অর্ধকোটি মানুষ এবং এ ঘটনা নাকি গত ১০০ বছরেও দেখা যায় নি (আনন্দবাজার ২৯।৮।৭০, অমৃতবাজার ২।৯।৭০) উড়িষ্যার বৈতরণী, নর্মদা নদীর বন্যার ফলে জাজপুর, দশরথপুর, ইন্দোর, কেন্দ্রপাড়া ও কটক জেলার বহু অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ফলে ফসল সমেত পাঁচলক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন (আনন্দবাজার ৭।৯।৭০, অমৃতবাজার ২।৯।৭০)। গুজরাটের বিধ্বংসী বন্যায় ৯০ জনের মৃত্যু ঘটেছে (আনন্দবাজার ২৭।৯।৭০) এবং পূর্ব-পাকিস্তানে পর পর তিনবছর বন্যার পরও এবার বরিশাল জেলার বন্যায় আট লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন (আনন্দবাজার ৯।৯।৭০)। বর্ষা ও নদীর মিঠে জলের বন্যার সাথে সাথে সমুদ্রের লোনা জল ও করুণা করে প্রতিবছর ভারতবাসীকে। "গত কটালে সুন্দরবন অঞ্চলের কাকদ্বীপ, নামখানা এবং পাথর-প্রতিমা থানার ৩৫টি গ্রাম লোনা জলে প্লাবিত হয়েছে। ৪০০টি ঘর পড়ে গেছে এবং ৫০৯ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন (আনন্দবাজার ২।৯।৭০)। লোনা জল ফসলের কেমন ক্ষতি করে তা চাষী মাত্রই জানেন।

একা বন্যা নয়, প্রতিবছর খরাও ভারতবাসীর জীবনে আনে বিপর্যয়। "তাপদগ্ধ বিহারে, বিশেষ করে ঘনি অঞ্চলে চরম জলকষ্ট চলছে···বড়জানুদি ঘনি এলাকায় একটিন কাদাগোলা জল প্রতিদিন ৫০ পয়সা থেকে ৭৫ পয়সায় বিক্রি হচ্ছে (আনন্দবাজার ১৭।৫।৭০)" বিহারের মন্ত্রী আই, পি, সাহী ও অন্য তিনজন মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, রাঁচী ও সিংভূম জেলা

বাদ দিয়ে ভানুই থেকে ডালটনগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা খরায় ঝলসে গেছে···ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০ লক্ষের মত মানুষ···এই অঞ্চল খরায় এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা ৬৭ সালের খরাকেও হার মানায় (আনন্দবাজার ২৯।৮।৭০)। গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে প্রতিবছর খরায় প্রচণ্ড পানীয় জলের অভাব, মৃত্যু ও ফসল ক্ষতির কথাও দৈনিক বাজারী পত্রিকাগুলো মাঝে মাঝে প্রকাশ করে।

এই বন্যা ও খরা জিইয়ে রাখার অবশ্যম্ভাবী ফল হল দেশব্যাপী চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ। প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আত্মসম্মানের জন্য কোনো এলাকাকে দুর্ভিক্ষ উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেন না ঠিকই—কিন্তু তাদের উকিল বাজারী কাগজগুলো কিছু কিছু সংবাদ ফাঁস করে দিতে বাধ্য হয়। যেমন "বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলায় মার্চমাস থেকে এ পর্যন্ত ৬০ জনের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে (আনন্দবাজার ১৭।৪।৭০)। বিহারের রাজ্য এস, এস, পির চেয়ারম্যান উপেন্দ্র বর্মা বলেছেন "এ বছর উপযুক্ত পরিমাণ বর্ষা না হওয়ায় এবং যথোচিত সেচের ব্যবস্থা না থাকায় বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে (২৪।৮।৭০ যুগান্তর) রেডক্রশ সোসাইটি এক সংখ্যাতত্ত্বে দেখিয়েছেন—মধ্যপ্রদেশের শতকরা ৪৮ জন মানুষ অনাহার ও অপুষ্টির দরুণ ১৪ বছরের বেশী পৃথিবীকে দেখতে পায় না। একজন স্বাভাবিক মানুষের যেখানে ২০০০ ক্যালরী খাদ্যের দরকার সেখানে ভারতবাসী গড়ে ১০০০ ক্যালরীর ও কম খাদ্য খান তা প্রতিটি সংবাদপত্র পাঠকই জানেন। তাই খুব সহজেই বলা যায় বন্যা-খরা আর দুর্ভিক্ষ ভারতবাসীর নিত্য সঙ্গী হয়েছে। ভারতের গরিব, কি নিম্ন মধ্যবিত্ত, কৃষক সম্প্রদায়ই এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এই নিত্য সঙ্গী বন্যা-খরার ফলে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ কি শুধুই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শুধুই আমলাতন্ত্রের অকর্মন্যতা, শুধুই ডি, ভি, সির কর্তৃপক্ষের দোষ? না কি অন্তরালে মূল কারণ কিছু আছে!

ভারতবাসীর জীবনে প্রতিবছরে এই বন্যা-খরা এবং তার জন্যে এই চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে এ পর্যন্ত যতগুলো মতামত এসেছে তা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সরকারীপক্ষ ও তার সমর্থকেরা বলেন—এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোনো হাত নেই; তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই অবশ্যম্ভাবী ফলকে স্বীকার করে যতটা সম্ভব রিলিফের বন্দোবস্ত করা (২) সরকারের বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ বামপন্থী নামধারী পার্টিগুলো বলেন প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়কে রোধ করতে না পারার জন্য দায়ী সরকারী আমলাতন্ত্রের গাফিলতি কেননা তারা ডি, ভি, সি ও অন্যান্য বন্যা-খরা-প্রতিরোধের যে প্ল্যানগুলো তৈরী হয়েছিল তা কার্যকরী করেন না, উপরন্তু যখন তখন খুশীমত ডি, ভি, সির থেকে জল ছেড়ে দিয়ে বন্যা বাড়িয়ে তোলেন। তাই তারা সরকারী আমলাতন্ত্রের কাছে ডি, ভি, সি ও অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার দাবী জানান (দেশহিতৈষী ১৮।৯।৭০, স্টেটস্‌ম্যান ২৫।৯।৭০)।

কিন্তু আমরা বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণার সাধারণ বন্যা পীড়িত লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জেনেছি তাতে তারা জোর দিয়ে একটা কথা বলেছেন—সরকার আমাদের বুঝিয়ে ছিল, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখন দেখছি এ বাঁধ বন্যা কমানো তো দূরের কথা, বন্যাকে আরও বাড়িয়েই দিচ্ছে। তাহলে এ কি ধরণের বাঁধ? গ্রামের সাধারণ 'অজ্ঞ' লোকেদের মুখ থেকে যে কথাটি বেরিয়ে এসেছে এবং যা তারা জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন—তাইই তুলে ধরেছে একটি মূল সত্য। কয়েকটা বড় পরিকল্পনা করলেই সমস্যার সমাধান হয় না—মূল প্রশ্নটা হোলো এটা কারা করছে এবং কার স্বার্থে এটা তৈরী হচ্ছে? এটা এড়িয়ে ফাঁকা পরিকল্পনার কথা বলা ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ সরকারী, বেসরকারী, বাম, অ-বাম সব পক্ষের বক্তব্যেই এটা উহ্য থাকে।

গ্রামের ঐ 'মূর্খ' মানুষগুলির বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বোঝা ঘটনাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতে গেলে একটু অতীতের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় জর্জরিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মানুষ দুর্দশায় অতিষ্ঠ হয়ে যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন, তখন সেই বিক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য বৃটিশ তার "বন্যা অনুসন্ধান কমিটি", আমেরিকার "টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার" অনুকরণে "দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনা"র কথা উত্থাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরিকল্পনাকে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের বন্যা-খরার নিয়ন্ত্রণের এবং সেচ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ নাওয়াই এই ঢাকঢোল পিটিয়ে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ১৯৪৬ সালে এই 'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জন্ম দিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে মহামান্য নেহেরুজী প্রধানমন্ত্রী হবার পর স্বাভাবিকভাবে আগের ঐ পরিকল্পনাই বহাল থাকলো। বরফগলা জলে পুষ্ট নদী আর বর্ষাজল পুষ্ট নদীর ভাগ্যে জুটলো একই পরিকল্পনা। বৃটিশ-আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ভারতের ইঞ্জিনিয়াররাও পরিকল্পনার নামে এত বড় একটা ধাপ্পাবাজী—যা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে—চোকগিলে হজম করে নিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের নদনদী পরিকল্পনার গুণগান ঠিক বৃটিশ গভর্ণরের মতই দায়িত্বহীন ভাবে দেশবিদেশের জনতার কাছে প্রচারিত হচ্ছে। আর ভারতবাসী সেই গুণের খপ্পরে পড়ে প্রতিবছরই নিদারুণ কষ্টভোগ করে চলেছেন।

আমেরিকা, বৃটিশ আর তার ভারতীয় দালালদের এই বিধ্বংসী-কুটিল আত্মঘাতী চক্রান্ত যে ভারতবর্ষকে কোন পথে নিয়ে যাবে তা ভারতের বাঘা 'বিপ্লবীরা' ধরতে না পারলেও বা ধরতে পেরে চেপে গেলেও তখনকার ডি. ভি. সির একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু বুঝতে পেরে সরবে গর্জন করে উঠেছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে কপিল ভট্টাচার্য নাম দিয়ে "বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা" নামে একখানা বই লিখে সব চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছিলেন। আর সেই অপরাধে ভারতবর্ষের হর্তাকর্তা বৃটিশ আমেরিকা তার চাকরিটাও খেয়ে নেন।

ঐ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন, "প্রথম যখন দামোদর পরিকল্পনা রূপায়িত হতে যাচ্ছিল তখনই বলেছিলাম ঐ পরিকল্পনার মারাত্মক ত্রুটির ফলে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই হুগলীর মোহনা এমন মজে যাবে যে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ আর কলিকাতা বন্দর অবধি যাতায়াত করতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবছরই ভয়াবহ বন্যার কবলে কবলে পড়বে। সরকারীপক্ষ বাক্-চাতুরী দিয়ে আমার আশঙ্কা অমূলক বলে প্রচার করেছিলেন। ১৯৫৬ ও '৫৯ সালের ভয়াবহ বন্যা চোখে আঙুল দিয়ে কিন্তু প্রমাণ করেছে বাক্-চাতুরীতে বৈজ্ঞানিক সত্য চাপা দেওয়া যায় না। ঐ বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন, "আজ সরকারী পরিকল্পনা দেশের মানুষকে এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, প্রধানতঃ বিদেশী পরামর্শদাতাদের কুটিল চক্রান্তে।" এই একই বইতে লেখক 'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' অধ্যায়ের শেষে মন্তব্যে বলেছেন, "বর্তমান দামোদর পরিকল্পনা সারাদেশকে আধা-উপনিবেশিক কৃষি অর্থনীতিতে বেঁধে রাখা হচ্ছে (পৃষ্ঠা ৭১)।" সরকারী পক্ষ ও তাদের সমর্থকরা যারা বন্যা-খরাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে সমস্যাটির গুরুত্ব হালকা করতে চান এবং আমেরিকা, বৃটিশ, রাশিয়ার "মহানুভবতার" প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা কি কখনো ভারতের উপর ঐ 'মহানুভবদের' আধিপত্যের আগের হাজার বছরের এবং আধিপত্যের পরের সোয়া দু'শ বছরের বন্যা-খরার তুলনামূলক হিসাব করে দেখেছেন? যদি করেন তবেই দেখতে পাবেন, আধিপত্যের পরের সোয়া দু'শ বছরে বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষ অনেক বেশী বেড়ে গেছে। এই সোয়া দু'শ বছরে ভারতবাসী কি এমন পাপ করল যে তাদের উপর প্রকৃতির হঠাৎ এত ক্রুর দৃষ্টি? অথচ যারা শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে শত শত পাপকার্য করেছে এবং এখনো একনাগাড়ে ভিয়েৎনামে, কম্বোডিয়ায়, লাওস এবং আরব দুনিয়ায় করে চলেছে—তাদের দেশে অর্থাৎ আমেরিকায়, রাশিয়ায়, বৃটেনে নেই সেই বন্যা-খরা।

আজ বিজ্ঞানের যুগে প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতাকে মানুষ নানান কৌশলে জয় করেছে। জয় করেছে আপনাদের 'মহানুভব, বড় কর্তারা অর্থাৎ আমেরিকা, বৃটেন রাশিয়া ও অন্যান্যরা! এতই যদি তারা মহানুভব তবে কিননা তারা আমাদের দেশের বন্যা-খরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। গরীব দেশের ওপর যদি এতই তাদের দরদ তবে তাদের দেশের উদ্বৃত্ত গম—যা তারা পশুকে খাওয়ান নয়তো সমুদ্রে ঢালেন—বিনা পয়সায় তো তারা ভারতকে দিতে পারেন। ভারতের জন্যে এতই যদি তাদের প্রাণ কাঁদে তবে তারা যে ৩০,০০০ কোটি টাকা (বর্তমানে আরও বেশী) ভারতে খাটান সে টাকাটা তো মকুব করে দিতে পারেন—আকাশে স্পুটনিক উড়িয়ে, প্রতিদিন ভূগর্ভে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে কত টাকাই তো তারা নষ্ট করছেন।

দালালদের মহানুভব আখ্যা দেওয়া ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা তা কখনোই করে না। বরং সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে তাদের উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে তার উল্টোটাই করে। কপিল ভট্টাচার্য তাঁর বইতে এ কথা খুব ভালভাবেই বিবৃত করেছেন।

"১৯০১—'০২ সালে কোলাঘাটে যখন রেলওয়ে পুলটি নির্মিত হয় তখন ইঞ্জিনিয়াররা এই পুলে অধেষ্ট জলপ্রবাহের ব্যবস্থা খোলা রাখলেও নদীর মধ্যে ৯টি পোস্তা গেঁথেছিলেন তারা। এই পোস্তা গাঁথার ফলে সারা বছরের জোয়ার ভাটার সঙ্গে আনা পলি নদীগর্ভে পতিত হয়েছে, ঊষক-বিজ্ঞানের (Hydrostatics) নিয়ম অনুযায়ী অল্প জলের প্রবাহের গতি মন্থরিত হওয়ায় জন্যে রূপনারায়ণের খাত অনেক মজে গিয়েছে। কাজেই সুযোগ পেলেই নদীর জল উপচে দেশব্যাপী প্লাবনের সৃষ্টি করে।...দুঃখের বিষয় রেলপথ ও রাজপথের সেতু নির্মাতারা প্রধান লক্ষ্য রেখে তাদের নির্মিত সেতুগুলি যাতে ধ্বংস না হয় (পৃঃ ৪)।" অর্থাৎ বন্যা-খরার উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশগুলির মানুষগুলো মরুক কিন্তু পুলের দুর্ঘটনাজনিত ব্যাপারে কাঁচামাল আনা-নেওয়ায় এবং বিপ্লব দমনে সৈন্য চলাচলের যেন বিঘ্ন না হয়। কাজেই তারা নদীর খাত রক্ষা, নদীর জলপ্রবাহের সম্যক গতি রক্ষায় নজর দেন না। ফলে দেখা যায় আমাদের দেশে সেতু নির্মাণের সাথে সাথে নদীর খাত নিহত হয়েছে ও জলনিকাশ ক্ষমতা ধ্বংস হয়েছে, প্লাবনের বৃদ্ধি হয়েছে।" (পৃঃ ৫)

"দামোদর পরিকল্পনার সংস্কার চাই' এই শিরনামায় লেখক আরও লিখেছেন" এই পরিকল্পনার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হতে পারতো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন।...কার্যতঃ সেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেরই কাজ পরিত্যক্ত হচ্ছে নানা অজুহাতে।...অবশ্য এ অবস্থা মোটেই আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত নয় কারণ যে বিদেশী স্বার্থ প্রথম থেকেই পরিকল্পনায় বাধা চোকাবার সুযোগ পেয়েছে সে স্বার্থ যে আমাদের দেশে সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে সেটা আমরা প্রথম থেকেই জানি।...নদীর খাত মজে যাবার ফলে নিম্নাঞ্চলে বন্যা বন্ধ হবে না।...সুষ্ঠু জলনিকাশী পরিকল্পনার অভাবে আরামবাগ মহকুমা, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর জেলায় বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে" (ঐ, পৃঃ ৭১)। "মোটকথা' শিরোনামায় লেখক বলেছেন, প্রধানতঃ ঠগ বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও তাদের দালাল, সাম্রাজ্যবাদীদের লালিত পালিত স্বদেশী তথাকথিত বিশেষজ্ঞের পরামর্শই (সরকারী পরিকল্পনায়) গৃহীত হয়েছে। যেসব স্বদেশী আজ সরকারের উচ্চতর ও উচ্চতম পদে আসীন, তাদের অধিকাংশই ব্রিটিশ আমলে শুধু রাজকার্যে সুখভোগ করেছিলেন।...ব্রিটিশ কর্তাদের আদেশ পালনই তাদের প্রধান কাজ ছিল...পদাধিকার বলে এরাই আজ সরকারের পরামর্শদাতা...রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ নানা কারণে এদেরই হাতের ক্রীড়নকমাত্র।...সুতরাং সরকারী পরিকল্পনার মূলনীতি গৃহীত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে অন্তরাল থেকে নির্দেশিত পরামর্শ অনুযায়ী...প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের পোষণের জন্যই আমাদের দেশের পরিকল্পনার কাজগুলিতে দেশের বিপুল অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে" (ঐ পৃঃ ১৫৩)। লেখক উগ্রপন্থী বা হঠকারী নন। একজন সৎ ও দেশপ্রেমিক ইঞ্জিনিয়ার। ভারতের পরিকল্পনাগুলি যে আসলে বিদেশীদের স্বার্থে তৈরী ভারতকে চিরস্থায়ী বন্যা-খরা এবং দুর্ভিক্ষ জিইয়ে ভিখিরীর দেশে পরিণত করে বিদেশীদের মুনাফা লুণ্ঠনের মৃগয়া ক্ষেত্র করে রাখার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ভারতীয় দালালদের চক্রান্ত তা ইনি বহুদিন

আগে ১৯৪৩ সালেই বুঝেছিলেন। অথচ আমাদের দেশের বামপন্থী নামধারী পার্টিগুলি একথা বুঝেও বুঝতে চান না এবং প্রধান শত্রু ও প্রধান কারণকে আড়াল করে অপ্রধান শত্রু ও অপ্রধান কারণকে নিয়ে হৈ চৈ করেন। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা না হওয়া জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের শাসন ও শোষণই যে দায়ী, এই মূল সত্যকে আড়াল করেন যারা ভারতের সামন্তবাদ, জাতীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ নিজেদের স্বার্থে এই বন্যা-খরার সমস্যাকে জিইয়ে রেখে বলেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, বন্যা-খরায় গ্রামের কৃষক উচ্ছেদ হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে সামন্তবাদের বেশী লাভ না বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বেশী লাভ? কৃষক নিঃস্ব হয়ে যাল কেনার ক্ষমতা কমে গেলে 'জাতীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বেশী লাভ না বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বেশী লাভ? আমেরিকা, বৃটেনের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কি তাদের দেশে বন্যা-খরা জিইয়ে রেখেছে? রোগের মূল কারণকে না দেখিয়ে রোগ চিকিৎসার কথা বলা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারতে বন্যা খরা জিইয়ে রেখে চিরদুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করায় লাভ কার?

এতে লাভ হলো আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ইত্যাদি দেশগুলির বড় বড় পুঁজিপতিদের আর তাদের ভারতীয় দালালদের। কি সে লাভ? (১) ভারতের জনগণকে আশু সমস্যায় জড়িয়ে রাখতে পারলে তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে সবাই একজোট হয়ে চিরদিনের মত বাঁচার চেষ্টায় চেষ্টিত হবে না। (২) প্রচণ্ড আর্থিক বিপর্যয়ে ফেলে দিয়ে দেশের লোকের সামনে কিছু ভিক্ষার পাত্র তুলে দিয়ে দাতা সাজা যায় এবং দাতাদের উপর লোকের শ্রদ্ধার মনোভাব অতি সহজেই তৈরী করা যায় যাতে হাজার দোষ করলেও দাতাদের বিরুদ্ধে সহজে হাত না ওঠে। (৩) এই বিপর্যয়ের সুযোগে সবারই দৃষ্টি যখন নিজেকে বাঁচানোর তখন সাহায্যের ভাঁওতা দিয়ে নিজেদের দেশের উদ্বৃত্ত মাল চড়া দামে এ দেশে বিক্রি করা যায়। (৪) একই দেশের কোনো এলাকাকে সমস্যায় ও কোনো এলাকাকে কম সমস্যায় করে ভারতবাসীকে দিয়ে ভারতবাসীর বিপ্লব দমনের কাজকে পাকা করা। (৫) এই বিপর্যয়ের সময় যখন সমস্ত সচেতন অসচেতন মানুষের দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ তখন তারা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে ও চোরা কারবার করে নিজেদের পকেটে মোটা টাকা পুরতে পারে। (৬) বড় লোকদের জমিদারদের টাকা থাকে বলে বন্যার পরে আবার ফসল ফলিয়ে সে ফসল অনেক চড়া দামে বিক্রি করে টাকা কমাতে পারে। (৭) গ্রামের নিঃস্ব বিক্রি করতে বাধ্য হয়, ফলে বিদেশী পুঁজিপতি এবং তার দালালদের মুনাফাই বেড়ে যায়। দালাল বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলোর হাতদিয়ে জনতাকে কিছু পাইয়ে দিয়ে (যাতে তারা জনতার আশু বিশ্বাসভাজন হতে পারে) গদিতে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়। সমাধান কোন পথে?

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষ যখন এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে পাড়ি দিতে শিখেছে তখন বন্যা-খরা এবং তার জন্য দুর্ভিক্ষ সমাধানের দায়িত্ব এগিয়ে যে রাষ্ট্রশক্তি প্রকৃতির ঘোর

জনসংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি কতগুলো সেকেলে অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট বুলি আওড়ান তখনই ধরা পড়ে যায় তাদের জাতীয়তা বিরোধী, জনগণ বিরোধী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাঠের পুতুলের চরিত্র। কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আজ ভারতের জনগণ ক্রমশ বুঝতে পারছেন কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম সংখ্যক পরিকল্পনা এলাকার প্রয়োজন ও সুবিধা অসুবিধার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণ না করে আন্দাজে পরিকল্পনা প্রয়োজন নেই অথচ মোটা টাকার পরিকল্পনা এসবের আসল উদ্দেশ্যই একদিকে চাকচোল পিটিয়ে নেতাকে শান্ত রাখা অন্যদিকে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি ও তাদের ম্যানেজার ভারতীয় মুনাফাখোরদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেওয়া। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই বন্যা-খরা রোধের সঠিক পরিকল্পনা ও তার পার্থক্য রূপায়ন সম্ভব। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও তাই। সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা কবলিত চীনে হোয়াংহো সাম্রাজ্যবাদী দালালরা চীনের 'Sorrow of China' বলে প্রচার করেছিলেন। কারণ তখন তাদেরই অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলে হোয়াংহো নদীর সর্বনাশা বন্যা বারবার চীন জাতিকে বিপর্যস্ত করতো। কিন্তু ১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নয়াগণতান্ত্রিক চীন আজ যার সমাজতন্ত্রে উত্তোরণ হয়েছে সে দেশের নবীনদের কাছে বন্যা-খরা মানুষের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। চিরতরে দূরীভূত করি এই ইচ্ছাকৃত—বন্যা-খরা ও দুর্ভিক্ষকে!

প্রতিদান

পরেশ সাহু

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ সাম্মানিক বাংলা

শীতের দুপুর।

আহার শেষে শীতটা যেন আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরে।

তাই চাদরটা গায়ে জড়িয়ে জানালার ধারে বিছানায় গা এলিয়ে অলস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। ধারের আম গাছটায় কিছু নূতন পাতা গজিয়েছে। তার ওপর পড়ন্ত বেলার সূর্যালোক পড়ে একটা সোনালী আভা ছড়িয়ে চিক্ চিক্ করছে। চারিদিকের স্তব্ধতা যেন মধ্যাহ্নের আবহাওয়াকেই প্রকট করে তুলে আমাদের মত কর্মহীন গোষ্ঠীর চোখে নিদ্রালু ভাব এনে দিয়েছে। আমারও তাই চোখ দু'টি বুজে আসছিল। এমন সময় বাইরে মায়ের গলা শুনতে গেলাম কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলছেন—"না বাছা ও কিনতে পারবো না, ছেলেপিলের হাতে পড়লেই কেটে যাবে, শুধু পয়সা জলে দেওয়া।"

উত্তরে আর একটি কাতর স্বর শুনলাম—"নিন না মা, চার পয়সা তো মাত্র, এতে কিন্তু আমাদের কিছু উপকার হবে।" গলাটা কেমন যেন ধরা ধরা শুনলাম।

আমার কৌতূহল হলো। তাই চাদরটা সামলাতে সামলাতে উঠে গিয়ে দেখলাম একটি দশ এগার বছরের ছেলে বেলুন হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"কি ব্যাপার।" ছেলেটি কিছু বলবার পূর্বেই মা বললেন, "দেখ না, বেলুন কিনব না তবু বলছে কিনুন কিনুন, আমরা এ দিয়ে কি করব, বাচ্চাটি তো হাতে পেলেই ফাটাবে, শুধু পয়সা নষ্ট করা নয়।"

আমি বললাম, "দেখ ভাই, বেলুন নিয়ে খেলবার মত আমাদের বাসায় কেউ নেই, শুধু শুধু কিনে কি করবো বলো।" ছেলেটি বলল, "দাদাবাবু আমার মায়ের ভীষণ অসুখ, তাই আপনাদের কাছে এই কাকুতি, যা আপনাদের কাছ থেকে আসবে, তাই আমার সাহায্য হবে," আমি ভাবলাম, এইরকম গল্প বলে অনেকেই সাধারণের সহানুভূতি আদায় করে আজকাল ঠকিয়ে যায়। ছোট বলে এদের পক্ষে আরো সুবিধে। তাই রুক্ষ হয়ে বললাম, "এই-রকম গল্প অনেকেই বলে, কাজেই অন্য ব্যবস্থা কর।"

ছেলেটি কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠলো, "না দাদাবাবু, মিথ্যে কথা একবর্ণও নয়, আপনি বিশ্বাস না করেন দেখবেন চলুন। কাছেই আমাদের বাড়ি। ঝোঁক চাপল। বললাম, "চল দেখব—সত্যি হলে যথাসাহায্য করব, আর মিথ্যে হলে বুঝতেই পারছ।"

ছেলেটির পেছনে পেছনে কাছেই এক বস্তিতে এসে উঠলাম। এখানে পাকিস্থান থেকে বিতাড়িত অনেক উদ্বাস্তুও আশ্রয় নিয়েছে। যুবরাজ এও তাদের একজন।

একটি ঘরে এসে দেখলাম মেঝেতে ছিন্ন কাঁথায় মুড়ি দিয়ে একটি মধ্য বয়স্কা নারী শুয়ে আছেন। ছেলেটি কাছে গিয়ে ডাকল—"মা।" কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার ডাকল—মা—তবু কোন সাড়া নেই! এবার গায়ে ধাক্কা দিল। তবু তার স্তব্ধতার অবসান হলো না। আমি কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। দেখে বুঝতে পারলাম যে ও নিস্তব্ধতার অবসান আর হবে না। সকলের অজ্ঞাতে কোন এক সময় তার প্রাণ পাখি পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। আর ছেলেটি মাকে জড়িয়ে ভীষণ কান্নাকাটি করছে। আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না।

অতঃপর আমাকেই তার সৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে হলো। অসুস্থতায় কোন সাহায্য করতে না পেরে একরকম নিরাশ হয়ে অসহায় ছেলেটিকেই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসলুম।

সদ্য মাতৃহারার নিকট শুনলাম তার অতীত জীবনের এক করুণ ইতিবৃত্ত। অবস্থা ভালই ছিল। মুসলমানের আক্রমণে বাবাকে হারিয়ে মাকে নিয়ে কোন কোনক্রমে জীবন বাঁচিয়ে চলে এসেছে এখানে। মায়ের কাজ ঠোঙা তৈরী। আর ছেলের কাজ বেলুন বিক্রি। এই ভাবেই চলছিল দুজনের এই ছোট্ট সংসার। ঈশ্বর তাও সইলেন না। বসন্তের করাল গ্রাসে চিকিৎসার অভাবে সমীর তার মাকে হারালো; আর আমাদের সংসারের একজন হয়ে স্নেহের ভাগ দাবী করলো এবং সকলের অজ্ঞাতে আমাদেরই একজন হয়ে পড়লো।

এর মধ্যে কয়েক বছর কাটলো। সমীর আমাদের বাজার সরকার। ছোট ভাইটির পাহারাদার ও আমার অনুগত আজ্ঞাবহ সহচর। চরিত্রবলে সমীর সত্যই অতুলনীয়! মাঝে মাঝে আমাদের কাছ থেকে কিছু কিছু পয়সা পেত। কিন্তু বাজে খরচ করতো না, তার ছিল একটি বালির কৌটো। তাতেই সে তা' জমিয়ে রাখতো, আমরা বলতাম, "ও আর জমিয়ে কি হবে, খেলে তবু পেট ভরবে।" ও উত্তর করতো—"যা যাচ্ছি আপনাদের দয়ায় পেট ভরেই যাচ্ছি। আপনাদের স্নেহের দান জমানই ভাল, ওতে হয়ত একদিন কোন একজনের প্রাণ বাঁচবে। কথাটা তখন হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তখন চিন্তাও করি নাই যে কথাটি কতদূর সত্য হয়ে দেখা দেবে। এটাই 'ড্রামাটিক্ আয়রনি!'

অফিস ষ্ট্রাইকের ফলে দাদার কাজ আজ দুমাস বন্ধ। ফলে হাতও একদম খালি। কিন্তু এদিকে ছোট ভাইএর হল টাইফয়েড্। ডাক্তার ডাকার মত পয়সা তখন হাতে নেই। কিন্তু রোগ তো তা শুনবে না, একদিন রাত্রে চরম আকার ধারণ করলো। সকলের মুখে চিন্তার ছাপ। এমন সময় সমীর তার জমানো টাকার পচিশটি টাকা এনে তুলে দিল আমার হাতে। চোখে জল আসলো—কিন্তু তা চেপেই ছুটতে হল ডাক্তার ডাকতে।

ভাই ভালো হয়ে উঠল। সমীর বলতো খোকা ভাল হলে, ভাত খেলে, ঠাকুরবাড়ি

আমি পূজা দেব ওর নামে।" যেদিন ভাই ভাত খেল, সেদিন কি কেউ জানতো যে এ বাড়িতেই আনন্দের ভেতর এক শোকের ছায়া ঘনিয়ে আসবে।

সবীর দাদনের ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিল তার জমানো শেষ কটি পয়সা নিয়ে পূজা দিতে।

এও ছিল শীতের দুপুর। অভ্যাস মত শোবার ব্যবস্থা করবো—এমন সময় পাশের রাস্তায় চিৎকার উঠলো—"গেছে গেছে।"

লাফ দিয়ে বাইরে এসে দেখলাম রাস্তায় ভীড় জমে গেছে। এগিয়ে গিয়ে ভীড় ঠেলে যা দেখলাম তা কল্পনায়ও কোনদিন দেখবার ইচ্ছা ছিল না—

মাতাল লরী চালকের চাকার তলায় সম্পূর্ণরূপে পিষ্ট হয়ে গেছে বেচারী সবীরের ছোট দেহটা। আর রাস্তায় ছড়িয়ে আছে কিছু সন্দেশ আর কিছু ফুল—রক্ত জবাটা যেন ওরই রক্তের ছোঁয়ায় লাল হয়ে আছে।

আমাদের দেওয়া প্রতিটি পয়সা নিঃশেষ করে আমাদেরই একটি প্রাণ বাঁচিয়ে সে তার শেষ কর্তব্য করে পরপারে তার প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো।

অপর নাম জীবন

কৈলাশচন্দ্র মল্লিক

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ বানিজ্য বিভাগ

কারো মুখে কোন কথা নেই। এক সীমাহীন স্তব্ধতা দুজনকে বুঝি মূক করে দিয়েছে। নদীতে ক্লান্ত সূর্যের শেষ রক্তিম আভা চিক্‌চিক্ করছে। চারিধারে আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলা শান্ত পাখিরা নীড়ে ফিরছে। আকাশে কিসের ছোঁয়া লেগেছে। ভোঁ ভোঁ শব্দে একটা ষ্টিমার জল কেটে এগিয়ে চলেছে—আকাশে বাতাসে মন কেমনের হাওয়া হেমন্তের সন্ধ্যা কেমন একটা শীতের আমেজ মনের মধ্যে শির শির করে উঠছে। মনে হয় একটা সাপ যেন বুকের মধ্য পথ দিয়ে সর্পিল গতিতে উপর থেকে নিচে নামছে।

সাগরই নীরবতা ভঙ্গ করলে কেমন আছ?

তটিনি মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। সেই ভারেই উত্তর দিল মন্থর না থমথমে মুহূর্তটাকে লঘু করার প্রয়াসের সাহায্যে সাগর বললো তারপর? কোথায় আছ এখন? মাসিমা, মেসোমশাই সব কেমন আছেন? অঙ্কুর……!

তটিনি মুখ ফেরালো। চোখ দুটো ছলছল, বেদনায় নিবিড়তায় মণি দুটো স্থির, মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে সবকথা উচ্চারণ করার মত নিস্তব্ধ স্বরে বললো, বছর দুই আগে বাবা-মা একমাসের ব্যবধানে মারা গেছেন। আর অঙ্কুর……

বলতে বলতে চোখ দিয়ে মুক্তাবিন্দুর মত ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো, সাগর বিচলিত হয়ে পড়লো, বিপর্যস্ত অসহায়ত্বে তার মনের সমুদ্রে, অনেক দিন পরে নতুন করে আবার একটা স্নেহের দ্বীপ জন্মগ্রহণ করলো, অন্তরের শেষ দুয়ার অতিক্রম করে এক পরম মমতা শিখা তটিনির না বলা দুঃখকে গ্রাস করতে চাইল। অধীরতায় তটিনির পিঠে হাত দিয়ে ফেললো। হাত দিয়ে কেমন যেন একটা সঙ্কোচের ভাব সংক্রামিত হলো। বুঝলো উচিত হয়নি, কিন্তু অন্যভাবে কি করে তটিনিকে সান্ত্বনা দেবে, তাই হাতের মাধ্যমে অবচেতন মন বুঝি যেন আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলো। অনেকদিন পর দেখা হলেও ছোট বেলায় সেই মনোভাবটাই হারিয়ে যাওয়া অচ্ছেদ্য বন্ধনকে জীবনের সেই গভীর সত্যকে আরো কাছে পেতে চাইলো। হাতে একটু চাপ দিয়ে বললো, থামলে কেন! বলো কি হয়েছে অঙ্কুরের?

তটিনি অস্পষ্ট ভাবে বিড়বিড় করে বললো: তার জীবনের বিপর্যয়ের করুণ কাহিনে এক অধীর হৃদয় আর এক রিক্ত হৃদয়ের নির্মম সত্যকে জানলো। অর্থাভাবে, বিনা

চিকিৎসায় তটিনির ছোট ভাই অঙ্কুর জীবনের প্রারম্ভেই জীবন ক্ষেত্রে তকিয়ে মারা গেছে মধীকৃষ্ণ হতে পারে নি।

ধীরে ধীরে আবছা অন্ধকারের পাতলা কুয়াশা সব ঢেকে ফেলছে ম্লান সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে অতি কাছের জনকেও আর দেখা যাচ্ছে না মানুষ মাঝে মাঝে তার নিজের মনের কেন্দ্র বিন্দুতে অযথা ঘুরে মরে কিছু করার, কিছু জানার ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে পারে না। সেই সময় মানুষটাকে যেন অন্য জগতের লোক মনে হয় ভাবালুলতার আবেশে মিইয়ে পড়ে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরা কি কিছু ভাবতে পারি না? যেমন এখন একটা কিছু করা উচিত, অথচ করতে পারছে না। কিন্তু কেন পারে না? এই জিজ্ঞাসা ছোটবেলা থেকেই সাগরকে চিন্তার মালা পড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ ইচ্ছে করলে সব পারে। লোকে হাসতে পারে। আনন্দে কাঁদতে পারে।

কিন্তু? না, আজ ঠিক এই মুহূর্তে সাগর সেন তার শৈশবের সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। নিজের জীবনই তার উত্তর 'যেমন এখন একটা কিছু করা উচিত'। অথচ পারছে না। সেই দীর্ঘ অদেখার উঁচু প্রাচীরটা এখনও যে তাদের দুজনের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দুঃখের বন্ধনকে নিজের মনে করলে হয়তো ও একটু শান্তি পেতে পারে। তাই ওর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আর অপরাধী বলে মনে হলো না।

মহাকাল এগিয়ে চলেছে। দুই নিশ্চুপ জীবন মুখোমুখি বসে দুই মনেরই অরণ্যে এক অব্যক্ত বেদনার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বয়ে চলেছে। বেপথু আবেগ সব স্নায়ুগুলোকে আস্তে আস্তে কোমলতার পরশে আলগা করে দিচ্ছে। করুণ এক মূর্ছনা সাগরের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো।

কাঁদবার কি আছে? এই পৃথিবীতে কেউ অমর নয়।

সস্নেহে গলে পড়ে সাগর।

জানি। তটিনি অস্ফুটস্বরে বললো।

দুঃখ করো না। এই জীবনের বিধান ঈশ্বরের প্রতি যদি তোমার এতটুকু বিশ্বাস থাকে, তাহলে নিশ্চিন্ত জেনো, সব হারানোর প্রতিদান একদিন—না—একদিন একটা নির্ভরতার ঠিকানা খুঁজে পাবেই।

দোহাই সাগর। তুমি একটু চুপ করো। তোমার ওই অদৃশ্য অদৃষ্ট পুরুষের নাম আমার সামনে বার বার উচ্চারণ করো না। ভদ্রলোকের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

না জেনে তোমায় আঘাত দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত তটিনি। আমি···

সাগর কিছু মনে করো না। এক এক সময় আমি নিজেই নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, আজকাল আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। তাই না?

জিজ্ঞাসুনেত্রে সাগরের দিকে তাকিয়ে তটিনি, আস্তে আস্তে বিমর্ষ ভাবটা কাটিয়ে উচ্ছল হবার চেষ্টা করলো। এই দেখ, সেই থেকে দুজনেই আজে বাজে কথার ভীড়ে আসল

কথাগুলোই জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গেছি। কোথা থেকে ফিরছিলে?

অফিস থেকে। আর তুমি?

আমি? আমি রিহার্সাল দিয়ে ফিরছিলাম।

রিহার্সাল?

হাঁ। থিয়েটারের রিহার্সাল। আজকাল আমি এ্যামেচার বোর্ডে থিয়েটার করি। বাবামা মারা যাওয়ার পর এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। যাক ওসব কথা, তোমার কথা কিছু বলো?

আমি আবার মানুষ—তার আবার কথা। তোমার মতই জীবন জগতে একা একা ভেসে বেড়াচ্ছি। জানি না, এই ক্লান্তিবিহীন যাত্রার শেষ কোথায়?

অন্ধকারে তটিনি সাগরের মুখ দেখতে পেলো না। দেখতে পেলে হয়তো দেখতো তার নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি সাগরের মুখে প্রতিফলিত। জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত এক নীড়হারা এক সৈনিক। তুমি আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছ।

তুমিও।

বিয়ে না করলে!

না। ছোট্ট জবাব।

তুমি।

সেই একই পুনরাবৃত্তি: "না"।

অনেকদিন পর দেখা হলো।

হাঁ। তা প্রায় ১০ বছর পর।

তুমি কিন্তু আগের থেকে পাল্টে গেছ।

এই পরিবর্তনশীল জগতে সব কিছু পালটাচ্ছে আর আমিও পাল্টে যাব, এটা আর এমন কি আশ্চর্য ব্যাপার?

এটা তুমি রাগ করে বললে?

না। সাগর পৃথিবীতে কারো উপর আমার আর রাগ নেই। প্রথম প্রথম রাগ করতাম, হিংসা করতাম, অভিমান করতাম। পরে দেখলাম এই সব ভেবে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। আর তাছাড়া কারো উপর কি অধিকারেই বা রাগ করবো?

কেন? এমন একজনও কেউ নেই যার উপর রাগ করতে পার। অভিমান করতে পার।

সাগর মিথ্যে তোমায় বলবো না। একদিন একজন ছিল মনের অনেক কাছে। সেই ছোটবেলা থেকেই তাকে ঘিরে ছিল আমার জীবন, আমার স্বপ্ন, আমার পৃথিবী। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। কোথায় সে হারিয়ে গেল। বলতে বলতে তটিনির চোখে নেমে এলো ঘনিল মায়ার আবেগ ঘন কাজল কালো আবেশ।

তটিনি। অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো সাগর।

দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। মনের পর্দায় ভেসে উঠলো ফেলে আসা জীবনের ছবি। অতীতের অন্দর মহল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে স্মৃতির জোনাকিরা মনের জানালায় হানা দিতে লাগলো। কতদিন হলো, তবু যেন মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। দেখা হবার কথা নয়। তবু দেখা হয়ে গেল। আশ্চর্য যোগাযোগ। দুই গোলার্ধের দুই মানুষ। কাছ দিয়ে একটা বাদামওলা হাঁক দিয়ে চলে গেল। দূরে কারা যেন হেসে উঠলো।

মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে পড়তো। খুব যখন মন খারাপ হয়ে যেতো, তখন ভাবতাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে বুঝি, জীবনের এক অসতর্ক মুহূর্তে যে ভুল করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

একটু থেমে বললো, কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল জীবনটা তাই না। সাগর?

হাঁ। তটিনি। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক, নইলে তুমি আমিই বা কেন দু'জনে দুজনের থেকে দূরে থাকবো।

তটিনির মনে হলো সাগর সেন ওর কানে কানে কথাগুলো বললো। কথাটা মনে হতেই তটিনির তিরিশটা বসন্তের পোড় খাওয়া দেহটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কেন এমন হয়? কৈশরের ভুল করা প্রশ্নের উত্তর কি সারা জীবনেও পাওয়া যাবে না? কত দিন পর দেখা হলো। সাগর সেই আগের মতই আছে? ওর মনে কি এতটুকু দয়া মায়া নেই! তবে নীরব কেন? কত কথা বলার, কত কথা শোনার সেই মুহূর্ত কি আসেনি জীবনে। আশ্চর্য মানুষের মন ভয়ে এত নিষ্ঠুর হতে পারে। জীবন পাত্রে যা উঠেছে, তাই যদি পান করেই থাকি, সেটা দোষের? পুরুষের বেলায় কেন দোষ হয় না। যুগে যুগে নারীত্বে এই অপমান কেন? এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় না। সনাতন প্রথাগুলোই সমাজের সর্বনাশের মূল কারণ? কি যন্ত্রণা! তটিনির মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে পড়লো কাতরতা সূচক শব্দ!

সাগর বলে উঠলো কি হলো?

না কিছু না। মাথাটা একটু ধরেছে।

তবে উঠা যাক। তোমার আবার তো রিহার্সাল আছে।

তটিনি সাগরের একটা হাত চেপে ধরলো। নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললো, কতদিন পর দেখা হলো, একটু বসবে না। রিহার্সাল তো রোজই দিচ্ছি।

তটিনি।

বলো।

সেই সব ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

হাঁ সাগর। সেই সব দিনগুলোর স্মৃতিই একমাত্র জীবনের পাথর। সেই নিয়েই ত বেঁচে আছি। আর কি জীবনে আছে। জীবনে কত প্রলোভন এল, কত প্রতিশ্রুতি এল। কিন্তু পারলাম না তোমায় ভুলতে, পারলাম না ভুলতে তোমায় আমার সেই ফেলে আসা দিন-গুলোকে। আমি তোমার স্মৃতির কাছে হেরে গেলাম। সাগর হেরে গেলাম।

তটিনি, তুমি কাঁদছো ?

জানো, এক এক সময় মনে হতো নিজেকে ধ্বংস করে ফেলি, এই দৈনন্দিন অবক্ষয়ের মাঝে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ ? তাই মনে হতো কোন কিছু খেয়ে আত্মহত্যা করি। এই আনন্দবিহীন দিন যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি কোথায় বলতে পারো ! বলো না সাগর, কি সে মুক্তি পাওয়া যায় ? সারা জীবনভরে দেখে এলাম নৈরাশ্য আর হতাশ, দহন আর জ্বালা, ব্যাথা আর বেদনা। অন্ধকারের নিরেট দেওয়ালে এত মাথা ঠুকলাম, কই তবু আলো কোথায় ! সে আলোর সিড়ি বেয়ে, মুক্তির ঘরে পৌছাব ! বল না সাগর।

তটিনি, আমাদের সেই মাষ্টার মশাইএর কথা তোমার মনে আছে। তাঁর সেই কথা-গুলো আজ মনে পড়ছে। কত সত্য সেই জীবন দর্শন, তিনি বলতেন মানুষের দুঃখ একান্ত ভাবেই তার নিজস্ব। কিন্তু যে মানুষ অপরের দুঃখকে নিজের বলে ভাবতে পারে, সে তার ক্ষুদ্রতার গণ্ডি থেকে অনেক উঁচুতে। এই সংসার বড় নিষ্ঠুর, পেছিয়ে পড়লে কেউ ফিরেও তাকাবে না। তাই এগিয়ে চলে চরৈবতি নিজেকে মুক্ত করে এগিয়ে চলো, পিছনে থাক, হতাশা, গ্লানি, ভাঙো ঘোর, এই আমাদের জীবন বেদ কিন্তু সাগর জীবনের কাছে কি পেলাম ? জীবন ভরে জীবনকে যত দিয়েছি, তার প্রতিদানে কি পেলাম ? জানো তটিনি, পৃথিবীটা বড় বিচিত্র। এখানে কারোর দিন কাটে সোনার খাঁচায় বন্ধ থাকে না। সব পাখিটার আস্তে আস্তে সব পালটায় আজ দেখবে আছে, কাল দেখবে নেই।

সাগর, এই জীবন কি আমরা চেয়েছিলাম ?

তটিনি, চলো আমরা আবার আমাদের খেলা ঘরের সংসারে ফিরে যাই। তুমি···তুমি আমার সাথে যাবে। কোথায় ? ব্যগ্র কণ্ঠে তটিনি বললো।

আমার সংসারে, আমার স্বপ্নের বেলাভূমিতে। যাবে ?

কিন্তু সাগর, কোন অধিকারে যাবো ? তোমায় কি দিতে পেরেছি, যে তার প্রতিদানে তোমার ঐশ্বর্য ভোগ করতে যাবো ?

কেন ? নারীর সেই চিরন্তন অধিকারে যাবো। আমার স্ত্রীর অধিকারে।

কিন্তু আমার জীবনে অনেক নোংরা ঘেটেছি, অনেক পাঁকের তলায় অনেকবার ডুবেছি। জীবনের কাছ থেকে ছুটি চাই, আর পারছি না।

তটিনি।

সাগর, তাছাড়া তোমায় দেবার আমার কি আছে সব তো শুনলে এর পরেও আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন জড়াবে।

তটিনি তোমার আমার সেই শপথের কথা ভুলে গেলে সাগর, তবে তাই হোক যা চাইবে, যা ভাববে, আমি তাই তোমাকে জানবো, তোমাকে দেখবো, সেই আমার জীবন তুমিই আমার স্পন্দন সেই স্পন্দন ধ্বনিত হোক আমার সমগ্র সত্তায় ; অণু-পরমাণুতে শিরা—উপশিরায়।

অন্ধকারে অন্ধকার হলো। অতীতের ঘর থেকে বেড়িয়ে আসল দুটো জীবন। আকাশে কত তারা।

বৃত্ত

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ কলা

আজও আমি ওকে ভুলিনি। মাঝে মাঝে দুপুরের অবসরে ওর আমাকে লেখা চিঠিগুলো পড়ি, আর ভাবি, ওর আশংকা ছিল ওকে আমি ভুলে যাবো। আর ওকে যে ভুলিনি তার প্রমাণ এই লেখা, ব্যতিব্যস্ত জীবনের কয়েকটা শ্রেষ্ঠ বসন্ত কাটিয়েছি ওর নীল শাড়ির কালো পাড়ের সাথে পা ফেলে, কচি ঘাসের মাথা মাড়িয়ে, খোলা ময়দানের পাশে পাশে।

হতাশার পরিপূর্ণতায় যখন আমি আচ্ছন্ন, তখন ও আমায় তুলে ধরেছে। দিয়েছে বাঁচার আশ্বাস।

হঠাৎ কি যে হল! কেমন করেই বা জানাজানি হয়ে গেল জানি না। কফি হাউসের দোতালায় বসে ও আমায় বললে, "আর আমাদের বাড়ি যেও না। বাবা একেবারে ফায়ার হ'য়ে আছেন।"

আমি সদ্য ধরান সিগারেটটা অ্যাস্ট্রেতে ফেলে দিয়ে নতুন একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরলাম। লাইটারে পুশ করলাম। আগুন জ্বলল না। দোতলা থেকে নেবে এসে মনে হল, এতদিন লক্ষ্য করিনি, ট্রামের আওয়াজটা বড় বিশ্রী!

ঘটনাটা এখানেই শেষ হলে ভাল হত। কিন্তু যাকে নিয়ে এ লেখা তারই জন্য আবার তুলি হাতে বসতে হল ছবিতে ফিনিশিং টাচ দেবার জন্য।

পরের দিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল কলেজের করিডোরে। জনতার কথন বাঁচিয়ে, প্রাধ্যাপকের দোষ কাটিয়ে ও আমায় বললে, "ভয় পেওনা, নিউট্রন আর প্রোটনের মত নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ রেখে তোমাকেই কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকব চিরকাল।" চশমাটা মুছতে গিয়ে হাত স্লিপ করে মাটিতে পড়ে কাঁচটা গেল ভেঙ্গে। মাথা নিচু করে হাত ঘড়িতে দেখলাম বারটা পাঁচ!

Man Proposes, God disposes—ভাবি এক হয় আর, এরই প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের জীবন। বহুদিন পরে ঘটনার পর্দা উঠেছে হেদুয়ার মোড়ে, বৈকুণ্ঠ বুক হাউসের সামনে।

আমার স্ত্রী লীনাকে নিয়ে চলেছি সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে। অসম্ভব ভীড়ের জন্য দুটো বাস ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বাসটা ধরা গেল। বাসটা সবে স্টার্ট নিয়েছে।

হঠাৎ মনে হল আমার পকেট থেকে কে মানিব্যাগটা তুলে নিল। হাতটা ধরেও ধরতে পারলাম না। কিন্তু দূর থেকে অপসৃয়মান মানুষটাকে চিনতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না। মনে হল ঐ নীল শাড়িটা আমিই প্রেজেন্ট করেছিলুম কোন এক সপ্তমীর সকালে। লীনাকে বললাম, "নেমে এস, চল হেটে যাই।"

দিন দুই বাদে আমার মানিব্যাগটা ফেরত এল। একটা পয়সাও তার খোয়া যায়নি, শুধু নেই আমার পরিচয় পত্রের উপর আটা আধার ছবিটা।

স্বপ্নের সিঁড়িতে

অধ্যাপক সমীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মনে নেই কি বলেছি আলোক মেলায়
আজ আর মনে নেই পড়ন্ত বেলায়
যখন কেটেছে দিন কুলুকুলু শব্দ শুনে শুনে
যখন কেটেছে দিন ছলছল ঢেউ গুণে গুণে
তখন কি বলেছি আজ আর কাজ কি শুনে ?
সে নদীর গতিপথ হঠাৎ দিয়েছে বেঁকে···
আমিও তো তারই মতো ত্রস্তপায়ে এঁকে
যাই আনেক পায়ের চিহ্ন···অনেক পায়ের চিহ্ন দিয়ে
জীবনের স্বরচিত পথ। ছিন্নভিন্ন কাঁচের পাত্রে
স্মৃতির আয়নায় ভাসে জ্যোতির্ময়···হীরক···অনাদি,
আহা, কি মর্মন্তুদ সুদীপ্তের সলিল সমাধি।
অক্ষরটা ক্রুর ছিল—কি শ্যামল ছিল ছবি···
দীপাঞ্জনের সাথে কথার ঝুলকি তোলা সন্ধ্যা
অমিয়···কান্তি আজ ফেলে আসা দিন সবি।
আমি তো কখনও চাইনি ঘুমন্ত শিশুর বুকে
ছুঁড়ে দিতে লালসার ব্যর্থতার ঈর্ষার চাবুক—
আমিতো কখনো চাইনি আলোক-উন্মুখ
ফুলের বনে ছুটে যেতে সাথে নিয়ে ঘৃণার মুকুট···
আমিতো তোমারই মত অবজ্ঞাত প্রাণ
দুঃখের দিগন্তে পথ ঘুছে ফেরা কোনো এক
ব্যাকুল পাখির কণ্ঠলগ্ন নিঃসীম সন্তান।
বারবার বেঁকে যাওয়া নদীর হাত ধরে নিরিবিলি
চলে গেছি···বন্ধুদের শবাধার সরাবার সাজিয়ে সাজিয়ে।
তবুও অনেকদূর স্বপ্নের সিঁড়ি···রিক্ত কাধে আর নেই
সেই পথভ্রষ্ট স্বার্থক্লিষ্ট সুচতুর বন্ধুর সাপ···খালি
বেদনাকে আহত করে আবার পথের ধারে
কেন আমি বার বার খুজে ফিরি একমাত্র তাকেই
যে আমাকে প্রতারিত করে ॥

অভ্যুদয়

শিবপ্রসাদ মিত্র

তৃতীয় বর্ষ ॥ কলা

এবার আমি অভয়-মন্ত্রে জাগ্‌ব,
আমি মঙ্গলাস্ত্র মাগ্‌ব'
জাগবই আমি জাগ্‌ব।
এবার আমি নির্ভয়ে পথ চ'লব,
পথের কাঁটা নির্মম-পায়ে দ'ল্‌ব—
আমি চ'ল্‌ব ওগো চ'ল্‌ব।
এবার সকল আগল আপন হাতে ভাঙ্‌ব'।
আমি নবারুণ-রক্তে রাঙব'—
আমি ভাঙ্‌ব' ওগো ভাঙ্‌ব।
এবার আমার বাঁশী ভীষণ সুরে বাজবে,
হৃদয় আমার বিজলীর সম সাজবে—
বাজবে বাঁশী বাজবে।
এবার আমি প্রলয় নাচন নাচব,
মানুষের মত বাঁচ্‌ব'—
তামি তা-তা থৈ-থৈ নাচ্‌ব'।
এবার সকল কলুষ পুড়াবে আমার দৃষ্টি,
জাগবে হেথায় কল্যাণকর সৃষ্টি—
সব মলিনতা পুড়াবে আমার দৃষ্টি।
এবার জ্ঞানের আলো আন্‌ব' আমি লুটে
দুঃখ-বিপদ, শতেক বাধা টুটে—
আমি আন্‌ব' আলো লুটে।
এবার হবেই হবে নবীন অরুণোদয়,
এবার হবে নবীন অভ্যুদয়—
জানি, হবে নবীন অরুণোদয়।

নব জাগৃতির কবি

আলোক কুমার রায়

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ কলা

হে কবি,

জানি আমি, ধরিয়াছ বীণা তুমি রুদ্রতেজে বিচিত্রভঙ্গে,
তুলিয়াছ নবতান নবরাগে নিরলস নবীনা তরঙ্গে। জীবনের
জ্বালাময় শতছিদ্ররূপে, দ্বাররুদ্ধ করি তার ওপার এপারে,
তুলিয়াছ অকাতরে অমরবিতানে ॥

মহত্ব তোমার,

হে অতিথি, মাগিছে বঙ্গনির্বিচারে। চেয়ে দেখ আজ,
কঠিন শাসন বন্ধছয়ার মুক্ত করিছে সহোদর সব তব। করিওনা
ঘৃণা, ভুলিওনা অভাজনে, কবি তুমি ॥ রবি নিভে গেছে,
দীপশিখা তার আজিও জ্বলিছে। অনির্বাণ সম জ্বলিবে

অনন্তকাল,

অমর লেখনী সাজে ॥

হে কবি শোনো,

বিজ্ঞ তুমি, পূজ্য তুমি, বঙ্গজ সন্তান। দেশ মাগে নিকটে
তোমার, উৎসাহ আর অকুণ্ঠ দান অবদান ॥ হিংসাদ্বেষ,
কলুষবিহীন জাতির এ আহ্বান। করিওনা কবি করিওনা

মোদের

অবনত। মোচন করিতে জাতির বাঁধন জেগেছে মুক্ত অসি।
সেলাম্ জানাই হে মেহেরবান্, কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসী ॥

রবে চিরদিন কৃতজ্ঞ

এ দীন বঙ্গ, দীন বঙ্গবাসী তব গুনে। সঞ্চিত রাগপুঞ্জে
জীবনের শুভমুক্ত মহালগ্নে, আরক্ত রঞ্জিতহস্তে আরবার
শঙ্খনাদে ঘনঘটা করি রুদ্রবীনে তব, বজ্রতান করহ সৃজন ॥

প্রজ্বলিত কর বহ্নি প্রয়োজনে তব, রুদ্রতেজা ভীমা
ভয়ঙ্করীরূপে
অমরবাণী করিতে সিঞ্চন। সীমা অসীমের মিলনলগ্নে। গাও
কবি সুর শঙ্কম রাগে। টলুক বিজয়ী হিংসা দ্বেষ তেয়াগি,
স্থির, শান্ত হোক বঙ্গজননী।
অশ্রুনীরে ভাসি আজ,
অলস স্বপনজালে নয়নে নয়ন স্থির, ধৈর্য টুটে হয়। কবি
বুলাইয়ে দাও অঙ্গে অমরা সঞ্চিত বারি সঞ্চিত যতনে।
গনিব না উপহাস ভ্রমবশে, মোহজালে আচ্ছন্ন যদ্যপি॥
বান্দা হইয়া বাঁচিবারে চাহি দয়া কর মেহ'মান্!
জানাই সেলাম্ লাখো লাখো বার দোস্তীকা ইনাম্, সাম্যস্ত
সঞ্চিত ছিল তুলি দিনু অকপটে দীনের আরাজ
কর কৃপা, সাধ জাগে কবি হতে চাই ফরিয়াদ্॥

কোন এক বিস্মৃত মুহূর্তে

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ কলা

মনেরই অজান্তে কখন
তোমার ঘুমন্ত দেহের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি
নিয়ন আলোর জ্যোতি ঠিকরাচ্ছিল
তোমার মুখ থেকে আমার হাতে, মুখে
মাথার চুলে, জামায় এবং সর্বত্র—নীল।

ঘুরছিলাম যেন কোন্ অজানা গ্রহের
জটিল কক্ষপথে
সেখানে বাতাসে বিশ্বাস ঘাতকতা করেনি কখোনো
রক্তে লাগেনি আগুন যেন বা—।

আমার হাত থেকে খসে পড়েছিল
ফুটন্ত গোলাপের জলন্ত পাপড়ি
আমি হারাতে চাইনি সে নিবিড়তা—
সুখ, মানে বিচরণ—বিবৃতি পৃথিবীতে ;
আমাকেই পালাতে হোয়েছে তখন
এক্ একটা পদক্ষেপে এক্ একটা বিন্দুকে
পেছনে ঠেলে।

স্বপ্ন-শেষে

অপনকুমার রায়

দ্বিতীয় বর্ষ । দাম্পানিক বাঙলা

আমার স্বপ্ন শেষে—
জীবনের ২২টা নিষ্ফলা বছরের
দিকে তাই চেয়ে আছি নির্নিমেষে ॥
জীবনের প্রথম প্রভাতে সে
বলেছিল : "খোমোনা," আছি আমি "চলো"
রঙিন স্বপ্নে ডুবলাম—নইলে ?
যৌবনের প্রারম্ভেই মনটা কেন ক্লেদাক্ত হলো ॥
ব্যার্থতা—হতাশা—গ্লানি—অপমান
আমার জীবনের বিশেষণ
কেন ? উত্তর নেই কোন একজন
কে আমি ? কে দিয়েছে আশা ?
আমি কবি—জানিনা সে-কে ?
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে—মুখে নেই ভাষা ॥
কুটিল পৃথিবীর হিংস্র দাঁতগুলো—
আমাকে চিবোতে চায় ।
(সুতরাং) "বাঁচিতে চাহি এই সুন্দর ভুবনে"
একথা বলবো না আমি—কেন ?
বুকটা ভরা এখনো বিষাক্ত ব্যর্থতায় ॥

নির্ভীক বাঙ্গালী

দিলীপকুমার মাজী

তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান বিভাগ

সোচ্চার হয়ে উঠেছে
২৩ বছরের চাপা আগুন
পেয়েছে নতুন শক্তি
নতুন করে বাঁচার প্রাণ।
বাঁচাতে বাঙলা
করতে স্বাধীন ; দাঁড়াবে রুখে
ওরা নির্ভীক বাঙ্গালী
যতই চলুক বুলেট বুকে।

জাগো জাগো জাগো
বাঙ্গালী বীরগণ,
অন্যায় রুখতে কর
জীবন-মরণ পণ।
আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে
যতই দেখাক্‌না ভয়—
হয়োনাকো ভীত
শেষে হবে সত্যেরই জয়॥

আজকের বাংলাদেশ

অমলচন্দ্র দাস

প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় । বিজ্ঞান

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা
ছিল আমাদের এ বসুন্ধরা,
ছিল কত বিচিত্ররূপ
আজও দেখছি নানা কীর্তি অপরূপ !
পথে পথে মারামারি
যে সে স্থানে ধরাধরি ।
একি লীলাখেলা এ দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মাঝারে ।
আজ হরতাল, কাল বন্‌ধ, আনন্দে দামামা বাজারে !
মনে মনে সর্বদাই ভাবি
কোথা হতে এল এ মরণ চাবি ?
বোমা, ছুরি, লাঠি, সোটা
রাইফেল, বন্দুক, আছে গোটা গোটা,
আমাদের বড় ভাইদের হাতে ।
না মরে মারতে পারে যাতে ॥
এযুগ কি এমনি যাবে !
একাল কি এমনি রবে ?
না, প্রতিদিনই চলতে থাকবে ছুরি আর গুলি মারা,
আর মরবে নির্দোষ, পথের আবালবৃদ্ধ-বনিতারা ।
কেন ? এ দেশের এমনি হল ।
ভগবান ! তোমায় শুধাই বল ॥
কেন বা বসায়ে ছিলে সর্বোচ্চ আসনে,
কেনই বা করিলে তুমি সর্বনীচজনে,
ভুলি নাই সেকথা ঠিক রয়েছে মনে ।
ভগবান প্রার্থনা করি ফিরায়ে দাও অতীতের যুগ ।
আমাদের দয়া কর আমরা যে তোমারই ভৃত্যস্বরূপ ॥

এবং অবশেষে

মৃত্যুঞ্জয় নন্দী

দ্বিতীয় বর্ষ। বাণিজ্য

বিপ্লব কাকে বলে জানি না,
জানবার চেষ্টাও করিনি
কোনদিন। সবার মুখে মুখে
শুনেছি বাজার দরের মত।
কেমন যেন ঝাল ঝাল, টক্ টক্,
মিষ্টি মিষ্টি। লোভ সামলাতে না পেরে
মনে হল একটু চেখে দেখি।
সময় বুঝে জাতীয় পতাকা হাতে
নেমে পড়ি। কিসের দাবী? কেন দাবী?
রাখিনা অতশত খবর। নেমে পড়ি
ঠুলিপরা গরুর মত।
চলেছিলাম পতাকা হাতে
সবার চিৎকারে গলা মিলিয়ে।
বুঝতে পারছিলাম না ওরা কি
বলতে চায়। শুধু দেখছিলাম,
আকাশের দিকে চেয়ে পাগলের মত
হাত পা ছুঁড়ে চলেছে।
হঠাৎ কি হল জানি না;
নীল টুপির এক পিস্টলের আঘাতে
আমার পৈতৃক প্রাণটা
মার্টিনের রেলের মত
ধুক্‌ধুক্ করে বেরিয়ে গেল
মৃত্যুর সঙ্কেত ধ্বনিতে:
আমি দেখলাম—
কুকুরের তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত
পরা ছুটে চলে দ্রুতলয়ে।

কল্পনার ইন্দ্রধনুতে,
ওরা ফিরে এসে
আমার মৃতদেহটা তুলে নিলে ;
চন্দন আর ফুল-বেলপাতা দিয়ে
আমায় সাজাল।
কতলোক এলো গেল, কেউ ফেলল দু' ফোঁটা
চোখের জল।
কেউবা—আহা, আহা, বাছা আমার—
আমার মৃত আত্মাটা ঘিরে
অনেক বক্তৃতার ফুলঝুরি।
অবশেষে নিয়মমাফিক মানুষের কাঁধে চেপে
আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলল।
আমি পুড়ছি, পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছি ;
বুঝলাম না ওরা কেন
মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে।
ওরা আমার এক প্রতিকৃতি বানিয়ে
পাঁচমাথার মোড়ে বসিয়ে দিলে।
পাদদেশে কয়েকটি শব্দ :
সংগ্রামী আন্দোলনের শহীদ
শ্রীতরুণ সমাদ্দার।
আজ আর আমার মূর্তির কাছে
আসে না কেউ। দিনের বেলায়
পাখি পাখালিরা আমার মাথায় স্নেহভার
কুকর্ম নিক্ষেপ করে,
চাঁদিনী রাতে আমার মূর্তির পাশে
জমে ওঠে তরুণ তরুণীর প্রেমালাপ।
আমি শুধু চোখ বুজে দেখে যাই
আন্দোলন থেমে গেছে—
কোনো এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়॥

সুদিন

তপনকুমার পাল

দ্বিতীয় বর্ষ। বাণিজ্য।

রাত তখন নটা
ফিরছি কলেজ থেকে
হাতে আছে ব্রাফ্ খাতা।
চলছি চলছি বিধান সরনীর বুকের উপর দিয়ে।

যদিও লাইটের আলোটা আসছে চোখে
কুয়াশার মত লাগছে চারদিকে!
এমন সময় কি একটা চিৎকার শুনতে পেলাম অস্পষ্টভাবে
একটু এগিয়ে দেখি একটা লোক—
পড়ে আছে হেদোর কাছে।
বলছে: বাবু! একটা পয়সা দাও।
দিলাম তাকে দুটো পয়সা।

পরদিন যখন ফিরছি
তখন সেই লোকটি আবার চাচ্ছে—
বাবু! একটা পয়সা দাও।
তাকে দেখে মনে কষ্ট হল,
ভাবলাম, তাদের কেউ দয়া করে না কেন?

হাজার হাজার সাম্যবাদীর দেবতা আছে মোদের ঘরে
তাঁরা তবে এদের কেন নেয়নি আপনজন করে
বিবেক উত্তর দিল মোরে, তাঁরা নয়ত সর্বহারার দেবতা!
তাঁরা বড় বড় পুঁজিপতি কালোবাজারীর দেবতা?

হাজার হাজার বছর এভাবে
চলছে গরীবের প্রতি নির্জাতন
তাদেরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলার টাকায়
করছেন তাঁরা বিলাসব্যসন।
আসছে সুদিন। হবে, সেইদিন
এই ভাঁওতার অবসান,
সর্বহারারা তাঁদের ঘাড় ধরে
দেবে এ পৃথিবী থেকে নির্বাসন।

আহ্বান

রাজেন্দ্রলাল ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ বাণিজ্য

ওপার বাংলার মানুষ কাঁদে
কেঁদে কেঁদে ডাকে
তবু সেই ডাকের সাড়ায়
আমরা কেন উঠিনা গর্জন করে !
তাদের গলায় গলা মিলিয়ে
বলি না কেন বিশ্বের মাঝে
এ লড়াই জনগণের লড়াই।

লড়াই করে মরবে তারা
আনবে স্বাধীনতা
স্বাধীন তারা হবেই হবে
হোক না সে যত কঠিন
দুঃখকষ্ট সহ্য করে
আসবে তারা স্বাধীন করে
এই চির দুঃখকষ্ট প্রপীড়িত বাংলাদেশে।

জানি এর জন্যে হয়ত দিতে হচ্ছে ও হবে
কত অমূল্য প্রাণ
যাঁরা রইলেন তোমার আমার কাছে
চির অম্লান।
শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে গেল
বাংলাদেশের মাটি
কত তাজা প্রাণ দিল অক্লেশে
দেশের মুক্তি সংগ্রামী।

বিশ্বের মাঝে আপন গরিমায় প্রতিষ্ঠিত
বাংলাদেশের বাঙালী জাতি।

তাই আজ আহ্বান করি
এপার বাংলার বাঙালীদের
এস ভাই মিলে করি কাজ সব
ভুলে গিয়ে ভেদাভেদ
হিংসা দ্বেষ ছেড়ে যেন কাজ নিয়ে থাকি মেতে
মাতিয়া উঠি যেন দেশের কল্যাণে
জয় বাংলাদেশ !

জয় বাংলা

তপন পাল

প্রথম বর্ষ। বাণিজ্য

দুপুরবেলা,
সূর্যের রশ্মি দগ্ধ করছে বিশ্বকে
এমন সময় এলেম বনগাঁ সীমান্তে.
নিলেম আশ্রয় একটা গাছের তলায়
শুনতে পেলুম একটা অস্পষ্ট আওয়াজ :
'জয় বাংলা'
শব্দটি শুনে হল অবসান সবক্লান্তির।
ভাবলাম :
হ্যাঁ, ওরাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক,
ওরা নিরস্ত্র হয়েও মাভৈঃ রবে এগুচ্ছে অস্ত্রবানের সমীপে
শয়তানরা হত্যা করছে তাঁদের নির্বিচারে।
ঐ দুষমনরা জানে না মা বোনের সম্মান
তাঁদের করছে ধর্ষণ, তারপরে হত্যা,
এরূপে মরছে লাখে লাখে
আমিও বলি জয় বাংলা, জয় স্বাধীন বাংলা
আসছে, সুদিন হবে সেদিন এই হত্যার অবসান
ওদের হাতে শয়তানরা দেবে প্রাণ
বাঙালীরা সহ্য করবে না মায়ের অসম্মান
শয়তানের রক্তে পূজা দেবে মাকে, মায়েরই সন্তান।
মনে হয় ছুটে যাই ওদের কাছে
কিন্তু হায় আমি যে নিরুপায়
বাধা ওদের কাছে যেতে,
তবুও এপার থেকে একটি কথাই বলি আমি
জয় বাংলা জয় স্বাধীন বাংলা জয় হোক সকলের।

সুদূরের আহ্বান

জগদীশ বসাক

তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান

চুপি চুপি কথা বলো
রেলগাড়ির শব্দের মত—
সবাই অবাক হবে গর্জন শুনে,
ভুলে যাবে অতীতের কথা!

করুণাভরে কাছে টেনে নেবে,
সোনার পাপড়ি শোভা পায়—
ফুলের মতন!

তোমার শক্ত ডানা,
ব্যর্থ-শূন্যতায়—
আছড়াবে বারবার?

বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়—সম্বরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল

১৯৬৯—৭০/৭১

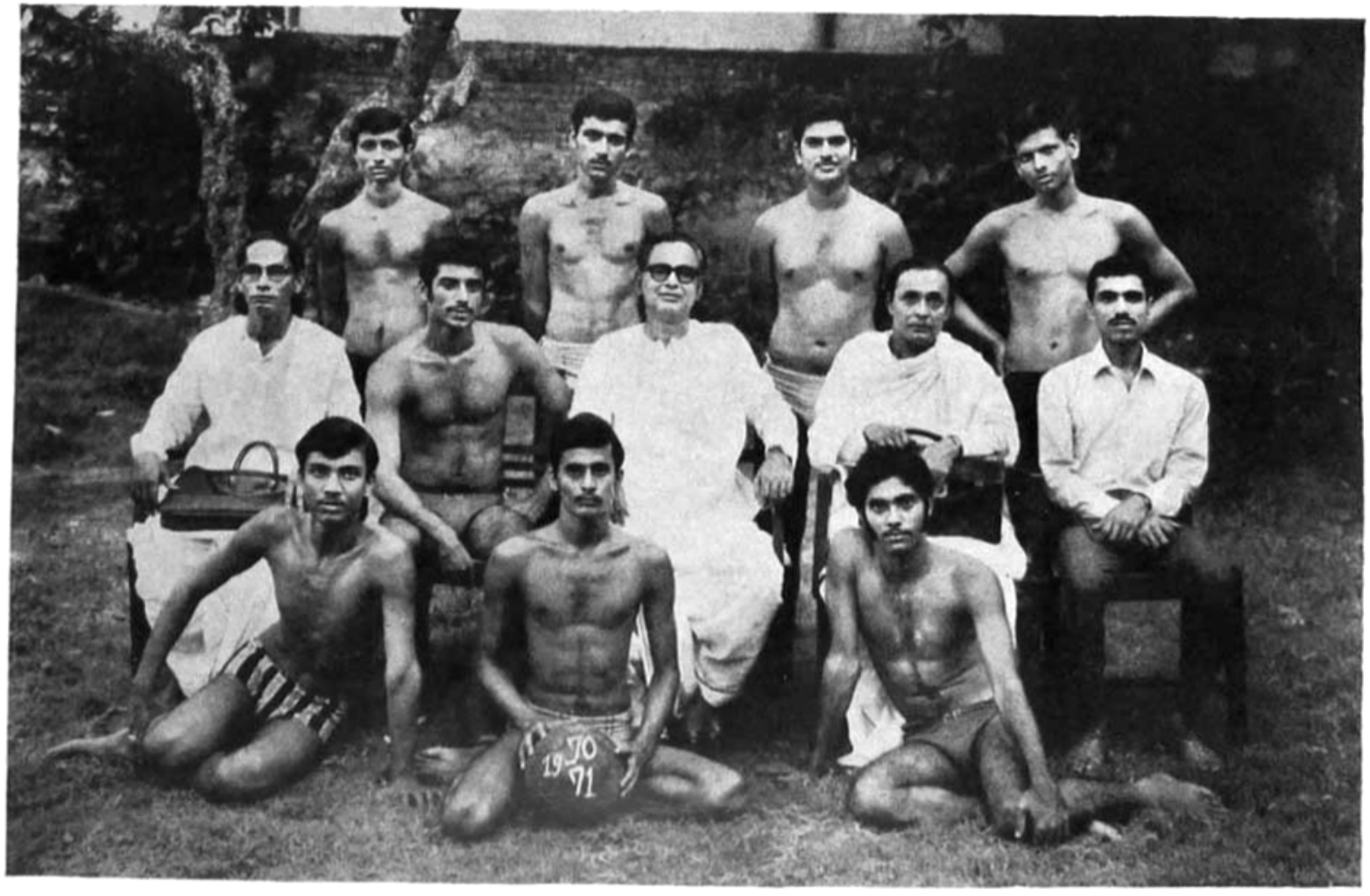

প্রথম সারি : শ্রীঅজিৎ বোস, শ্রীসুশীল কাপুর, শ্রীঅসীম দে ('ব্র'-প্রাপ্ত)।

দ্বিতীয় সারি : অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর, শ্রীবিধু সাধুখাঁ (অধিনায়ক—'ব্র'-প্রাপ্ত), অধ্যক্ষ শ্রীসুকুমার চৌধুরী; অধ্যাপক কমলা প্রসাদ ঘোষ, শ্রীউৎপল কুমার সেন (ক্রীড়া সম্পাদক)।

তৃতীয় সারি : (বাম হইতে) শ্রীমন্টু দত্ত ('ব্র'-প্রাপ্ত), শ্রীঅমলেন্দু সেন, শ্রীপরিমল চন্দ, শ্রীসজীব সাহা ('ব্র'-

বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

এন. সি. সি.—১৯৭০/৭১

এন. সি. সি. সভ্যদিগের সহিত উপবিষ্ট বাম হইতে দক্ষিণে — এম্. বোস ; এন্. সি. মিত্র ; সি. এন্ দাস ; অধ্যক্ষ সুকুমার চৌধুরী . আর. কে. চক্রবর্তী . ডে. কে. ঘোষ ও এম্. ঘোষ।

ক্রীড়া-পত্র

উৎপলকুমার সেন

ক্রীড়া সম্পাদক

রীতি অনুযায়ী এই পাতাটি বরাদ্দ ক্রীড়া-সম্পাদকের জন্য। সারা বছরের হিসেব-নিকেশ দাখিল করতে হয় ক্রীড়া সংক্রান্ত। তার ওপর গত দু'বছরের জমে যাওয়া হিসেব করতে গেলে পাওয়া না পাওয়া, আনন্দে বিষাদে ভরে উঠবে পাতাটা—এইটাই প্রচলিত। সেই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কলেজীয় ক্রীড়া জগতে আমাদের অবদান যথেষ্ট।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এথেলেটিক্সে আমরা অন্যান্য কলেজের শীর্ষে গত কয়েক বছর যাবৎ। সেই সম্মান আমরা গত দু'বছরে আরও উজ্জ্বল করেছি। প্রচুর 'রেকর্ড' সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন রেকর্ড ধ্বংস করে নজীর সৃষ্টিকারী নায়করা হলেন—যশন যাহা, তাপস পাল, দেবু ঘোষ। এই কলেজেরই মনোরঞ্জন পোড়েলের অবদান সর্বজন বিদিত—যদিও শারীরিক অসুস্থতা তার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অন্তরায় হয়েছিল। তবে এ বছর সে তিনটি রেকর্ড সৃষ্টি করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ওদিকে ক্রিকেট টীমকেও বলি দিল অসুস্থতা। প্রথম বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্রিকেট-নক-আউটে', কোয়ার্টার-ফাইনালে আমাদের খেলোয়াড়রা যথেষ্টভাবে আহত থাকার দরুণ মাঠে নামতে পারেনি।—শুক্রবার আমরা 'চতুর্থ রাউণ্ডে' একটা ভাল দলকে প্রচুর পরিশ্রম করে হারিয়েছি। মাঝে দু'দিন বিশ্রাম—শনিবার, রবিবার। সোমবারে কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলা যাতে পিছিয়ে যায় তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হলো না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া-দপ্তর না-মঞ্জুর করে দিলেন। এর পেছনে অবশ্য একটা ইতিহাস আছে। আমাদের প্রতিপক্ষ বিদ্যাসাগর দিবা কলেজ। খেলার দিন প্রথমে ধার্য হয়েছিল বৃহস্পতিবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ক্রিকেট পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার চাপে সরতে সরতে গ্রীষ্ম-কালীন ক্রিকেটে পরিণত হয়েছিল সেই বছর। শুক্রবার খেলা চলাকালীন আমাদের বেশ কিছু খেলোয়াড় আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। খেলার শেষে আমরা জানতে পারলাম খেলার দিন এগিয়ে এসেছে। প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করলাম—অধিনায়কও রাজী হলেন কিন্তু ভারপ্রাপ্ত ক্রীড়া-অধ্যাপক সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন আমাদের অনুরোধ নাকচ করে। যেহেতু আর কয়েকজন নামী খেলোয়াড়েরা তখন থেকে অর্থাৎ সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত অন্য খেলায় ব্যস্ত ছিল, সেইহেতু আমাদের পঙ্গু দলকে হারাতে দাক্ষায়ী দলের অসুবিধা হবে না। তার ওপর অম্বর রায় সেদিন দিল্লিতে খেলার

জন্ত, ফিরবে সোমবার রাত্রে। আমরা শেষপর্যন্ত একটা দিন সময় চাইলাম কোনরকমে দলটাকে মঙ্গলবার খাড়া করবো অম্বর রায়কে নিয়ে। তিনি পরিকল্পনা করেছেন নিখুঁত ভাবে, শুক্রবার মধ্যাহ্ন-ভোজন পর্যন্ত মাঠে থেকে—যখন দেখেছেন আমরা নিশ্চিন্ত জিতে যাচ্ছি তখনই কোথায় কলকাঠি নাড়লেন কে জানে? ফলে খেলা এগিয়ে এলো। শেষপর্যন্ত অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে আমরা মাঠে অনুপস্থিত ছিলাম। বিদ্যাসাগর দিবা স-কলেজের কাছে হেরে সে বছর দ্বিতীয় স্থান দখল করলো। আমরা রয়ে গেলাম সীমানার বাইরে।

পরেরবার টেস্ট-খেলোয়াড় পুষ্ট স-কলেজ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আমাদের পরাজিত করলো। এবারও অম্বর রায় মাঠে উপস্থিত থেকেও খেলতে পারলেন না; পায়ের আঘাতের জন্ত। যদিও সে খেললে আমরা জিততে পারতাম কি না সেটা তর্ক সাপেক্ষ, কারণ তার একার পক্ষে একটা মাঝারী দল নিয়ে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে জেতা অভাবনীয় তবে প্রতিদ্বন্দ্বীতাটা খুব জোরালো হতো নিঃসন্দেহে।

ফুটবলের উল্লেখযোগ্য অবদান আমরা এই প্রথম, কলেজীয় ইতিহাসে, বাইরে খেলতে গেলাম—এলাহাবাদের 'পাটু মজুমদার ট্রফি'। অবশ্ত পরাজয় বরণ করতে হলো কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষস্থানীয় দলের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল লীগ্, নক্-আউট ও অন্যান্ত খেলাগুলো সে বছর বতিল হয়ে যাওয়ায় আমরা বিশেষ নজীর দেখাবার সুযোগ পেলাম না। পরের বছরও তার পুনরাবৃত্তি। আমাদের দুর্ভাগ্য বলা চলে!

সেই অপ্রসন্ন ভাগ্য আমাদের আবার গ্রাস করলো ভলিবল মাঠে। যার পরিণামে আমাদের দাস্তনা পেতে হলে রানার্স ট্রফি ঘরে এনে। ভীষণ উত্তেজনা পূর্ণ খেলায় আমরা পরাজিত হলাম কোনোক্রমে।

হকি আসরে শান্তা-কলেজ খেলোয়াড়ের অভাব চিরকালই অনুপস্থিত। গত দু'বছরেও তার ব্যতিক্রম ঘটাতে পারিনি। কারণ ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, অ্যাথেলেটিক্স, সাঁতার ইত্যাদিতে নজর রাখতে গিয়ে হকি উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

টেবিল টেনিসে সেমি-ফাইন্যালের টেবিলে পৌঁছে ফিরে আসতে হয়েছিল প্রতিপক্ষের সরলতার জন্ত। এতদূর পর্যন্ত আমাদের দৌড় হবে এটা আসা করতে পারিনি। তার জন্ত ধন্যবাদ জানাতে হয়—দীপক চ্যাটার্জী, দেবীদাস, চণ্ডীদাস ও প্রদীপকে।

সাঁতারে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে কীর্তির নজীর সৃষ্টি করলেও দলগত শীর্ষস্থান দখল করতে পারিনি। যদিও প্রতিবারই 'রীলে-রেসে' আমরা প্রথম হয়ে রানার্স হবার সুযোগ পেয়েছি গত দু'বছর যাবৎ। অবশ্ত ডাইভিং'এ ফলীদাও অনন্ত।

এ বছর ওয়াটার-পোলোতে বড় অবদানে আমরা শীর্ষে। বিশ্ববিদ্যালয় এইবারই প্রথম ওয়াটার-পোলে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। আমরা সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় স-কলেজকে পরাজিত করে শীর্ষস্থান দখল করেছি। এটি অবিস্মরণীয় ঘটনার নিদর্শন।

আমাদের সবচেয়ে বড় দাবী আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় আমরাই সর্ববিভাগে প্রচুর খেলোয়াড় প্রেরণ করেছি।

পরিশেষে যাদের অবদান অনস্বীকার্য, তাদের সকলকেই আমার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও কলেজের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

অ্যাথেলেটিক্সে—পোড়েল, রীথ, তাপস ও দেবু এবং অন্যান্যদের।

ক্রিকেটে—অধিনায়ক অম্বর রায়, অরূপ চ্যাটার্জী, প্রবীর কর্মকার, চতুর্বেদী, সনৎ রায়, রাম চ্যাটার্জী ও অন্যান্য সহ খেলোয়াড়দের।

ফুটবল—অধিনায়ক ভাগবৎ ভুঁইয়া, শান্তি চক্রবর্তী, সমীর চক্রবর্তী রুনু চক্রবর্তী, মনতোষ সাহা, ভীম দত্ত প্রভৃতিদের।

ভলিবলে—অধিনায়ক দীপক ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জী, দেবু ব্যানার্জী, শেখর ব্যানার্জী ও অন্যান্যদের। সাঁতার ও ওয়াটার পোলোতে—অধিনায়ক বিষ্ণু গাঙ্গুলী, সঞ্জীব সাহা, জিমি কাবিরাজা, অসীম দে, কনী দত্ত, সুব্রত দাস, পূর্ণ দাস, পরিমল চন্দ এবং অংশ গ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীদের।

তাছাড়া অন্যান্য খেলোয়াড় যারা অংশ গ্রহণ করে বা সহযোগিতা করে আমাদের খেলার মান এবং যারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে তাদের সকলকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ জানাই কলেজের সকল অধ্যাপক মণ্ডলী, ছাত্রবন্ধু ও কলেজ কর্মচারীদের।

অবাঙ্গ শ্রীসুকুমার চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত ক্রীড়া অধ্যাপক শ্রীসমীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব), বর্তমান ক্রীড়া অধ্যাপক শ্রীদিবেন্দুরঞ্জন চৌধুরী এবং আমাদের শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক শ্রীদুর্গাশরণ কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মহাশয়দিগের নিকট আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের যথেষ্ট সহযোগিতা ও প্রেরণা আমাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

যে কোন কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। গত দু-বছরের ইতিহাসে কোন না কোন ক্ষেত্রে হয়তো সে ত্রুটির উর্ধে উঠতে পারিনি। সেই অক্ষমতাকে আজ বিদায়ের প্রাক্কালে সকলেই যদি স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে থাকেন তবে আন্তরিক সুখী হবো।

॥ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।··· বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।···গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"*

* 'বিদ্যাসাগর চরিত' (৮ ও ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

The early human environment of Rabindranath

Prof. Dhirananda Tagore

Although it is a truism to hold that genius, indicating a man's intellectual capabilities, is mostly an inherent and intrinsic thing, yet it cannot be gainsaid that the environment plays a considerable role in the making or unmaking of its success. The blossoming of the genius becomes easy and quick if the environ is propitious and often delayed and sometimes dried up if assailed by misfortunes and reverses. The poet Gray's conviction that chill penury freezes away the genial current of the soul is true to a great extent, though not absolutely.

It goes without saying that Rabindranath's genius was of a rare and outstanding order. But it cannot but be admitted that he was blessed and fortunate enough to have a favourable environment, immensely rich, materially and culturally, which, of course, he was able to utilise to the best advantage of the blooming of his genius.

Heritage does not mean only the legacy of affluency or indigency in financial condition but also the sunny or gloomy mental atmosphere of the family. The immediate family environment which Rabindranath inherited was intellectually and culturally very scintillating and congenial.

Debendranath, Rabindra's father, inherited a large fortune from his father Dwarakanath, who for his fabulous wealth and luxurious standard of life was known as prince Dwarakanath. Debendranath imbibed his father's luxurious mode of living. But this view of his life stayed only for a short period of three to four years at the most in the prime of his youth. But he became sober and grave when he was a young man of twentyone years only.

The death of his grand mother, Alaka Debi, suddenly brought about a sea-change in his mind. Thenceforward he plunged himself in the ocean of knowledge and wisdom. And although he studied selected philosophical writings of the West, he concentrated his attention on the study of religious and philosophical literatures of ancient India. The nineteenth century in Bengal was, to some extent at least, an age of reason and intellectual revolt. Some young people who became acquainted with the agnostic or the atheistic literatures

1. see page 6, 'Rabindra Jiboni' (Rabindra Biography), New edition, by Sri Prabhat Kumar Mukhopadhyay.

of the West came under their spell and rose or sought to rise in revolt against the traditional faiths and beliefs of ancient India. And in the upsurge even some eternal verities and sanctimonious moral values, achieved by agelong thinkings, were often either discarded or calumniated by the heterodox intellectuals of the time. But not all elites danced to their tunes. Fortunately, there were some among them who, with their level-headedness, equanimity of mind and serene sobriety, delved deep into ancient Indian cultures, material and spiritual, and discovered a good many gems and jewels from there although they kept their mind open and free towards the wisdom of the West. Debendranath was one of those illustrious personalities. He turned towards cultivation of theosophy, theology and spiritual literatures. His faith in God struck deeper roots when he took to the study of the Upanishads. Truth-seeker as he was, he was in quest of a rational religion, free from prejudices and superstitions. This he got in the religious and spiritual ideals of Rammohan Ray, a celebrated reformer of Hindu religion, propounder of rational spiritual culture and the founder of Brahmoism. Rammohan was a great synthesist of oriental and occidental ideals of life. Debendranath found in the ideals of Rammohan his long-cherished goal. He became an ardent follower of the savant and made it his mission to resurrect religion from the onslaughts of the extremists in the field.

Rabindranath's attachment to religious and spiritual ideals, his interests in the study of the Upanishads, his equipoised frame of mind, his balanced views of rational approach to life and the universe and several other qualities of head and heart may be attributed to the inheritance of his father's mental structure and also his culture. These resources facilitated much the flowering of his genius. But all the same, Rabindranath's far more discerningly receptive mind and like-mindedness with his father counted for much of his adaptability to the milieu. The quantum of spiritual or devotional literature, Poetry (songs and lyrics) and Prose (essays & dramas), composed by Rabindranath, is really immense. His deliberations, dissertations and discussions on religion and also on religious literatures should also be kept in view on this count. But it is not simply the quantity that elicits admiration from the readers. The subtle and profound feelings, the beatific and mystic vision expressed in the delicate and yet naively poetic language, appropriate rhythms and cadences and in superb tunes of his devotional songs and lyrics provide any sensibly sensitive mind with the pleroma of beatitude and fine felicities. His critically synthetic acumen, his innate capacity of sifting truths out of half-truths or untruths from various religious thoughts and, above all his liberal appreciativeness of the universal contributions of different spiritual philosophies are evidenced in his essays on religion and religious literatures and also in his religious dramas.

Debendranath's outlook on life and culture was never rigid. He provided a liberal and comprehensive education to his children. It was never his viewpoint to have their mind atrophied with hide-bound ideas and frigid conceptions. But he intended them to maintain grace and dignity in their go of life. Some maestros in music were engaged by him for imparting training in music to his sons and daughters. And Jyotirindranath, his fifth son, and also Rabindranath, having inherent proclivities for music, availed themselves of this opportunity with gay abandon and subsequently became prolific creators of tunes and verbal compositions of songs. His third son, Hemendranath also was very much interested in music and subsequently contributed much to the keeping up of musical atmosphere in the family. Here also is an example of unique unison of internal and external factors in the matter of efflorescence of genius

Debendranath had four brothers of whom two died in their childhood. The youngest of them died at the age of twentynine years approximately. Nothing is known about the life and career of the youngest brother. Girindranath, the third son of Dwarakanath, lived up to thirtyfour years. About his cultural activities also nothing has been recorded by Sri Prabhatkumar Mukhopadhyay, the celebrated biographer of Rabindranath. But from a passing reference by Rabindranath in his short autobiograhy 'Chhelebela' (Childhood Reminiscences) we have the opportunity to know that Girindranath[1] was intensely interested in drama and dramatic performances. He was the founder and director of an amateur yatra party (i e. an indigenous type of dramatic party). Rabindranath notes that he had the ability to compose plays[2]. He is known to have been the writer of a drama named 'Babubilas'. But as Girindranath, the second uncle of Rabindranath, died in 1854, seven years before the poet was born, he could not have a direct personal contact with the uncle. Yet it can be presumed that he left a somewhat substantial spirit of artistic culture that found further fellcitous expressions in the gladsome nature and aesthetic cultures of his two sons, Ganendranath and Gunendranath. Rabindranath has been almost eloquent in regard to the inspiration and encouragement he drew from their deeply loving nature and cultural activities.[3]

As noted by Sri Prabhatkumar Mukhopadhyay, an authoritative biographer of Rabindranath, Debendrath had fifteen children in all of whom

1. This can be gleaned from the very brief information on this score recorded by Rabindranath in his short autobiographical sketches in 'chhelebela' (Childhood Reminiscences)—Rabindra-Rachanavali, vol. 26, Page 603.

2. 'chhelebela' Rabindra-Rachanavali, vol. 26, Page 599

3. 'Jibon Smriti' : Do, vol. 17, Page 334.

nine were sons and six daughters. Among his daughters Swarnakumari Debi, the fifth one, was highly talented. She was the first woman novelist in Bengali literature. Her writings were much appreciated and even eulogised at that time. She was older than Rabindranath by about five years.

Of the nine sons the sixth and the ninth died in their infancy. The fourth and the seventh became affected with insanity or mental unsoundness. Dwijendranath was the eldest among the brothers. His was a multi faceted genius He was a literatteur of high order. His writings were stamped with his distinctive personality and originality. The poetry he wrote was more philosophical than poetic and the essays were very intellectual and critical[1]. This may be the reason why his writings could not be popular. He acquired vast and sound knowledge of the Eastern and the Western Philosophy. He was talented in music and mathematics too. Anyway, his contribution to cultural life of Bengal at that time and since cannot but be reckoned valuable. Indubitably he, to a great extent, inherited his father's mental frame and readily imibed the spirit of his father's culture. It was he who nurtured and nourished, broadened and diversified its spheres. He became the fountainhead of inspiration and enthusiasm for the cultivation of the Muses in the entire family[2]. Rabindranath owed much of the blooming of his genius to this opulent source. He was twentyone years younger than his eldest brother.

Satyendranath, the second son of Debendranath, was nineteen years older than Rabindranath. He became the first Indian who passed the Indian civil-Service test and was employed in the imperial service under the British rule. Heavily occupied with onerous official duties though, he was an ardent devotee to literature. The few books he wrote bespeak his profound erudition and firm command over language which was marked with logicality, clarity, spontaneity and simple grace. Rabindranath had the opportunity of living with Satyendranath[3] and his wife for sometime in Bombay and Calcutta. It goes without saying that he benefited much in their company from their affectionate love and also from the rich collection of books of his brother and the new milieu there.

Hemendranath[4], the third elder brother of Rabindranath, was seventeen years older than the poet. He was a strict disciplinarian and exacting task-master in the matter of imparting education to the youngsters in the family. But at the same time he was a man of broad outlook and variegated culture.

1. Chhelebela :—R-R, Vol. 26', P. 625.
2. Chhelebela : R R, Vol. 26, P. 626 and Jibon Smriti :
3. Do : R-R, Vol. 17, Ps. 357, 406, 411.
4. Jibon Smriti : R-R, Vol. 17, P. 285 and
Chhelebela : R-R, Vol. 26, Ps. 594, 603, 606.

He was intensely interested in European music and physical culture as well. Rabindranath with other children & adolescents in the family had to be under the vigilance and guidance of Hemendranath. But although Rabindranath felt a little constrained to undergo the discipline and routine training in different body and subjects, this could not but be very much helpful to the sturdy build-up of his mind. He inherited an exceptionally sound health which seldom fell a victim to an ailment. This positively helped him utilise his time and energy in the literary pursuit with indefatigable diligence. Furthermore, his highly sensitive and receptive mind had the easy opportunity to cull the gems of culture from the environ set up by Hemendranath.

Of all the brothers Jyotirindranath was the one from whom Rabindranath derived unreserved encouragement and maximum support in his cultural activities. Rabindranath himself admitted this[1]. It was in his company that the poet found his very own. Mention should also be made here of the loving and affectiononate care of Kadambari Debi[2], the wife of Jyotirindranath that sustained the poet much in his cultural pursuits. Jyotirindranath also was doubtdess a versatile genius. His contribution to literature, painting and specially to music is remarkable. He was a prolific creator of tunes. Rabindranath wove verbal textures into many of Jyotirindranath's tunes. His adroitness in the composition of songs, their words and tunes owed much to that source. It can be reasonably held that Rabindranath could not be much of what he had become if he would not get the abundant affection, loving care and guidance of Jyotirindranath, a magnanimous man of splendid cultures and also that of his wife. Jyotirindranath was twelve years older and his wife two years than Rabindranath.

There was one more elder brother of Rabindranath to whom the poet was somewhat indebted for encouragement and sympathy during the early period of his cultural pursuits. He was Somendranath. He was only two years older than Rabindranath. He was proud of his younger brother as a poet and felt very much pleased to make a publicity of Rabindra's poetry in boyhood. Rabindranath has gratefully recorded this in his autobiography named 'Jibon Smriti' (Reminiseences of life)[3]. 'But we do not get to learn anything about Somendranath's own cultural activities. It might be that he could not do so because he suffered subsequently from some mental ailment.

We should make a pointed reference also to a unique and wonderful, if not mysterious, event of Rabindranath's beginning of writing poetry. Jyotiprakash was one of his nephews (a son of one of his cousin sisters). He

1. Jibon Smriti : R-R, Vol. 17, Ps. 340-341.
2. Do : Do, Do, P. 329.
3. Jibon Smiti : R-R, Vol. 17, Ps. 283-284.

was about six years older than Rabindranath. It was he who of all persons in the family one day became very much enthusiastic to ask Rabindranath in an auspicious moment to write poetry, when the latter was a lad of only seven or eight years. The poet himself has conscientiously recorded this in his autobiography.[1]

The name of Satyaprasad Gangopadhyay, another nephew (a son of one of his own sisters), needs also be mentioned here for he was one of the companions in Rabindra's boyhood who also made the company happy. He was only two years older than Rabindranath. Sometime after Satyaprasad became the first publisher of the first anthology of Rabindra's poems.

It will be a dereliction of truth if, in the assessment of human contribution to the budding forth of the poetic genius of Rabindranath in his boyhood, the contribution of other human factors not having consanguinity is not taken into consideration. Among these special mention should be made of Iswar, Kailash Mukhopadhyay, Kishori Chottopadhyay, Visnu Chandra Chakrabarti, Nilkamal Ghosal, Sitanath Ghosh, Satkori Datta, Gobindababu, Srikanthababu, Father De Penaranda, Jnanchandra Bhattacharya, Ramsarvasva Bhattacharya, Akshoy Chandra Choudhuri, poet Biharilal Charaborti, Rajnarayan Basu, Lokendranath Palit, Maharaj Birchandra Manikya, Bankimchandra Chattopadhyay, Priyonath Sen, Rajendralal Mitra and Ashutosh Choudhuri. Poet Biharilal Chakrabarti and Ashutosh Choudhuri afterwards became his relatives.

Iswar or Brojeswar[2] was an attendant of Rabindranath and other boys of the family. In the evening he used to read the Bengali Ramayan or the Mahabharat regularly to keep the children engaged. Rabindranath with his sensitive mind had undoubtedly received the 'Payar Chhanda' (a fourteen-syllable line divided into two metres of eight and six syllables successively) in the subconscious region of his mind and was also impressed with the impressive stories of the two Bengali epics. This was subsequently unfolded in his writing of a verse in that metre by the suggestion of Jyotiprokash.

Kailash Mukhopadhyay[3] was an officer of the estates of Debendranath. He was a happy-go-lucky humorist. Rabindranath felt very pleased and amused by his rollicking humours. His heart swung with the lilting language and rhythmic flow of music of verses or ballads the humorist often used to recite.

Kishori Chattopadhyay[4] was another funny man there who was an attendant of Debendranath. He also Chanted now and then some alliterative Bengali

1. Jibon Smriti : R-R, vol. 17, P. 283.
2. Jibon Smriti : R-R, vol. 17, Ps. 277, 278,
   Chhelebela : R-R, vol. 26, Ps. 595, 597.
3. Jibon Smriti : R-R, vol. 17, Ps. 265, 266.
4. Jibon Smriti : R-R, vol. 17, P. 279.
   Chelebela : R-R, vol. 26, P. 597.

verses based on the Ramayan and charmed the children of the family. Rabindranath's innate sense of rhythm and tune could not but have been enkindled by Kishori Chattopadhyay's recitations. This sense of rhythm and tune which lay dormant in his mental entity was first awakened by an alliterative and rhythmic line in the Bengali first book by Iswarchandra Vidyasagar[1] or earlier perhaps by the ring and swing of the nonsense verse or ballads meant for children chanted to him. The line by Iswarchandra might have also intensified his feelings and rendered the imagination a little flighty by the suggestion of the scenic beauty of the rains dropping and the rain-flakes on the green leaves fluttering in a gentle breeze and by that of other associations of the rains in Bengal.

It is quite judicious to aver that Rabindranath's mental capabilities were nourished and his educational possibilities were sustained, to some extent at least, by the teachings of some of his teachers at home and also in the educational institutions where he studied for short periods though. Although he was averse to the stereo-typed system of education yet he benefited nonetheless from the teachings by winnowing out the unlikeable things and receiving only the likeable. Peregrinations of his literature help us realise that Rabindranath utilised his experiences and impressions about some of his teachers and also the knowledge he gained from them by giving them various literary shapes. Among the teachers he benefited from are the names such as Madhab Chandra Mukhopadhyay, Nilkamal Ghosal, Sitanath Ghosh, Aghorbabu, Satkori Datta, Gobindababu (the then superintendent of the Normal School), Father De Penaranda, Jnanchadra Bhattachrya, Ramsarvasva Bhattacharya and Henry Morley.

Outside the family circle, the persons from whom Rabindranath either learned singing or derived impetus and incentive for musical culture were Kishori Chattopadhyay, Visnuchandra Chakrabarti and Srikantha Sinha.

Rabindranath was surely fortunate to have some encouragement in the matter of composition of poetry from Satkori Datta and Gobindababu, the Headmaster and the Superintendent respectively of the Normal School when he was a student there.

Not all writers elicit plaudits from the contemporary readers and the critics even if their writings are fairly fine. And it sometime so happens that some good writers get only denunciation, if not derision, in the prime of their literary career. There was little such that Rabindranath had to encounter. On the contray, he received profuse inspiration, enthusiasm and reaped a rich harvest of literary sense and wisdom from the literatteurs, interested readers, and scholars like Akshoy Chandra Choudhuri, Biharilal Chakrabatti, Akshoy

1. J-S : R-R, vol. 17, P. 265.

Chandra Sarkar, Lokendranath Palit, Birchandra Manikya, Reverend Krisna Mohan Bandopadhyay, Bankim Chandra Chattopadhyay, Priyonath Sen, Rajendralal Mitra and Ashutosh Choudhuri.

Rabindranath was indeed very much fortunate to have been born and brought up in such a family environment which was not only affluent but also scintillating with much of the brilliant and beautiful mental faculties the human entity is heir to. This is why there has been a galaxy of aesthetes and aestheticians, creators and connoisseurs of arts covering almost the entire gamut. The entire atmosphere of the family was suffused with the spirit of refined sentiments and feelings, of subtle sense of beauty and of dignified decorum. But, above all these was the climate of love, affection and reverence, of peace, delectation and sublimity. The immensity of love providing abundant encouragement the poet received from his father and mother, from his brothers and also other relations was positively the most potent of forces that provided for the evolution of his genius. This climate may be conjectured to have emerged from the awareness of life's greatness and loveliness that may be traced to Debendranath's sense of life and the super-life received from the Upanishads as well as to the imperceptible undercurrent of Vaisnavic ideals, traditionally cultivated by his predecessors. There were a good many well-to-do families in Calcutta at that time but there was none other that could bequeathe such a rich legacy of aesthetic cultures to the country because there were no such highly cultural environs in those families. It is not simply Bengal, not even only India but the entire humanity that can legitimately be appreciative of the creative faculties and artistic creations of this family unfolded at that time.

But, finally, it has to be noted that besides Rabindranath's intellectual capabilities of the high order the two most salient determinants of his literary success were his love of freedom and the self-imposed discipline of indefatiguable labour. His love of freedom made him averse to being yoked to the conventional type of education and avocation. It is of course true that the financial circumstances of his family fortunately happened to be complementary to his love for freedom. Consequentially, he derived plenty of time to give expression to his multitudinous feelings and ideas. Were it not so, much of these could not flower forth or could have been extinct in the inchoate stage. But full credit should be given to him for utilising this benefit of the environment in the literary and cultural pursuits. He put in stupendous labour for this. His sound physical and mental health surely enabled him to undertake the arduous task without feeling in the least any boredom in that. If he were a lazy and indolent person or an ailing man, and would dilly-dally his time and energy then certainly he could not be so

much prolific in writing. It can be tangibly held that Rabindranath maintained a precise and regular life, though rhythmically punctuated with varieties of noble and artistic activities. The boundless innate inspiration, the sagacious confidence in his literary capabilities, the invincible determination to be a great writer doubtless made his labour not only unfeelable but pleasurable. So then it can be concluded that the combination of his mental and physical capabilities adequately nourished by the propitious environment in his early life, up to the prime of his youth enabled him to get off to a very good start and fully equipped him to be what he had been as a literary artist, an artist in general and an uncommon genius.

Electron Diffraction Phenomenon

AND

Its Applications

Prof. Haraprasad Mitra

The nature and properties of electrons are now-a-days well known to everybody. Electrons are the essential constituent of an atom of each substance. An atom of any element is made up of a central nucleus consisting of protons and neutron, surrounded by electrons moving in definite orbits. Electrons have got definite mass, charge and shape. Their particle nature was establishad beyond doubt by the end of the nineteenth century.

But the wave-like behaviour of electrons (and all material particles) under appropiate condition was suggested by Louis do Broglie in 1924. And that was proved experimentally first by Davidson and germer in 1927 and by Thomson in 1928 with the diffraction phenomenon of electrons. By the experiment of electron diffraction, the idea of "matter-waves" i.e. wave-like behaviour of materlal particles (e.g. electrons, protons, neutrons atoms etc.) was found to be correct. It must be mentioned in this connection that the concept of "matter-wave" helped two scientists to develope a new mechanies—under two different mathematical fomulations. This is "wave mechanies" by Schrodinger and "quantum mechanies" by Heisenberg. This mechanies can solve many problems os Atomic physics.

Now the wavelength of the "matter-wave" is given by tbe De Broghie relation,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

h = Planck's constant $= 6{\cdot}625 \times 10^{-27}$ erg – sec.
m = mass of the particle
v = velocity of the particle

If an electron of charge e ($4{\cdot}803 \times 10^{-10}$ esu) and mass m ($9{\cdot}1083 \times 10^{-28}$ gm.) moves under an accelerating voltage of V volts, we have.

$$\tfrac{1}{2}mv^2 = Ve$$

Combining thse two relations and substituting the values of h, m and e we get,

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m}\sqrt{\frac{m}{2Ve}} = \frac{h}{\sqrt{2em}}\frac{1}{\sqrt{V}} = \frac{12{\cdot}24}{\sqrt{V}} \times 10^{-8}\ cm$$

Hence if V be of the order of 100 volts, λ will be of the order of 10^{-8} cm or 1A°; and if V be of the order of 10 kilo volts, λ will be of the order of 0·01 A°. Of course, relativistic correction must be made for the exact value of the wavelength in case of high values of accelerating voltages.

For the experiment of electron—diffraction, Thomson worked with high energy electrons with the accebrating valtage ranging from 10 to 60 kilevolts. He used a method analogous to Debeye—Scherer powder methoh of X-ray analysis of crystal. A low pressure, cold-cathode discharge tube was the source of electrons. The necessary high potential was provided by an induction coil. The electrons passed through a hole in the anode and were collimated by a narrow tube about $\frac{1}{2}$mm .diameter and 60 cm long. On emerging from the collimator, the beam passed through the specimen in the form of thin metallic film. At a distance of 325 mm the electrons were allowed to fall on a fluorescent screen or a photographic plate. A symmetrical pattern consisting of concentic rings about a central spot was observed very much like that produced by X-rays in the powdered crystal method. It was further proved that the pattern was produced by electrons and not by secondary X-rays produced by electrons in their passage through metallic film.

Electrons are diffracted by a crystal in the same manner as X-rays. Electrons falling at a glancing angle θ to plane of atoms with inter-planar spacings d are reflected if Bragg equation

$$2d \sin\theta = \lambda$$

is satisfied. It is obvious that the angle between the incident and diffracted beam is 2θ. If, therefore, a beam of electrons is incident on a polycrystalline specimen, the diffracted beams will form a cone of semiangle 2θ, and therefore will fall on as photographic plate in a circle of radius R such that

$$\frac{R}{L} = \tan 2\theta$$

where L = camera length = distance between specimen and plate.

As θ or 2θ is very very small,

$$\sin\theta = \theta \quad \text{and} \quad \tan 2\theta = 2\theta$$

$$\text{Hence } R = L \tan 2\theta = L\,2\theta = \frac{L\cdot\lambda}{d} = \frac{L}{d}\,\frac{12{\cdot}24}{\sqrt{V}}$$

Therefore $R\sqrt{V}$ = constant, when L and d are fixed. This was found to be correct by Thomson ; this verifies the validity of De Broghie concept.

$$\text{Again } d = \frac{L\lambda}{R},$$

comparing this value of interplanar spacing d with the value known by X-ray method, the result were found to agree within 2%. This again verifies De Broglie's law.

Besides academic interest, the phenomenon of the electron diffration has found to be of much practical importance specially in the analysis of structure of different types of substances. The interaction of electrons with matter is stronger relative to X-rays, and this allows a very much smaller volume of material to be studied thus avoiding the often difficult problem of growing the relatively large single crystal necessary for X-ray diffraction studies. Even with these smaller volumes, photographic exposure times are of the order of the seconds in electron diffraction comparted to hours necessary in the X ray case.

The modern electron microscopes are always equipped with the facility of electron diffraction experiments. The change from image to diffraction pattern is accomplished within a few minutes simply by changing the strength of the intermediate lens. In normal microscope operation, the image plane of the objective lens and that of the intermediate lens are conjugate foci and an enlarged image of the object is produced. If the focal length of the intermediate lens is decreased until the objective back focal plane is conjugate to the intermadiate lens image plane, the diffraction pattern appears at the intermeniate image plane and finally on the screen or plate. This mode of operation is called the "micro-diffraction" or "selected area diffraction" method. Diffraction by this technique corresponds to "wide-angle diffraction" pattern. Substances with periodicities of the order of 1A° to 10A° can easily be studied by this method. The techdique of high resolution electron diffraction, as applied in electron microscope, have been developed to a stage where they may usefully be applied to problems in variety of fields. In many applications, electron diffractiou method, is in competition with or better than the well established methods of electron microscopy and X-ray diffraction.

However, this particular mode of electron diffraction has got limitations and fails to resolve higher periodicities of 10A° or more, so this method needs to be modified. Rregularly repeating structure occurs in biological systems, the periodicity is typically in the range of 50A° to 1000A° or even more ; the Bragg angle in the diffration study are correspondigly smaller and more difficult to resolve. A number of studies of such specimens—eg. Hemoglobin, lysozyme, bovine serum albumin, DNA, RNA, COLLAGEN etc have been performed by the "X-ray small angle diffration" technique but as the required resolution becomes higher, the optics of X-ray Collimating system become more critical and exposure times ate greatly increased.

The possibility of observing "small-angle diffraction" of electrons in conventional electron microscopes has recenty gained attention.

If the electron microscope is to be operated as a small angle diffraction camera, the particular optical arrangement selected must satisfy two conditions.

The first condition is that the angular resolution must be sufficient to resolve the details in the diffraction pattern. From the relation $d \times 2\theta = \lambda$, if $d = 1000A^{\circ}$, and $\lambda = 4{\cdot}177 \times 10^{-3}A^{\circ}$; the angle 2θ must be $4{\cdot}1 \times 10^{-5}$ radian. But this small anglar resolution is possible in electron miroscopes by overfocusing the condenser lenses.

Secondly, for focusing purposes, the size of the diffraction pattern on the viewing screen must be large enough for observation. The size of the pattern is governed by the "camera lenth" L, given by the relation

$$R = L.\phi.$$

The camera length of normal diffraction mode in electron microscopes is 40 cm to 70 cm. For small angle electron diffraction, the camera length should be of the order of 10 to 500 meters, depending upon the required resolution. This can be achieved by further magnification of the diffraction pattern thereby increasing the effective camera length. Different methods may be adopted for a large magnification of the diffraction pattern. In some cases, diffraction pattern is produced by the second condenser lens and magnification of this pattern takes place in two stages first by objective or intermediate lens and then by the projector lens. In Philips EM 200 or EM 300 electron microscopes, the diffraction pattern may be produced by the objective and first intermediate lens and magnified in two stages by the second intermediate and projector lens.

Small Angle Electron diffraction technique has got a very high potentiality in the experiments of structural analysis. The most important advantage of electron diffraction relative to X-ray technique is the possibility of obtaining a high resolution image of the specimen under investigation, within a few minutes without changing much in the experimental setup. In addition, in small angle diffraction, it is experimentally much easier to achieve the necessary high angular resolution with electrons than is the case with X-rays. The advantage of small angle electron diffraction relative to electron imaging is in the determination of accurate lattice parmeter. Magnifiction calibration in imaging condition is difficult and accuracies are seldom better than 5% ; but in small angle electron diffraction the camera length can be accurately calibrated using a standard specimen. Of course, there are number of difficulties associated with the application of small angle electron diffraction methods to structural analysis of biological materials. Perhaps the most important problem is that of specimen preservation particularly in the case of protein crystal. However, the use of negavive staining technique offesets this difficulty to a great extent ; and the use of modern high voltage (million volts) electron microscope will definitely help in overcoming the problem of specimen preservation by using atmospheric microcell.

Byronic Impact On Heathcliff In "Wuthering Heights"

Prof. Anupam Kumar Mukherjee

The victorian period was characterised in the novel by a superb development of realism, humour, and satire in the representation of manners, by the earnest study of social and industrial problems, and by a thorough exploitation of historical romance and of stories of intrigue and mystery. Later on it was particularly notable for a serious attack on problems of individual psychology and the art of living. Meantime the intense, starved life of three sisters immured in a gloomy vicarage on the yorkshire moors found indirect expression in several of the most powerfully emotional novels of this or any period.

The Contribution made by the Brontë sisters to English Literature in the eighteen forties has a unique flavour—a strange pungent mingling of wild romance and domestic realism, of cosmic poetry and local detail. They are belated Romantics. The influence of Byron on his Contempories has been made the matter of specialised research in many languages. His imprint lies as clearly on the writings of Goethe as on the music of Berlioz and the paintings of Delacroix. All this is known. But what perhaps has not so generally been realised is the direct influence of Byron's writings and character on Brontë sisters.

It was in the pages of Blackwood's that the young Brontës made their first contact with Byron. The circumstances of his death struck chords already vibrant in the hearts. A love of heroism coupled with a sense of beauty that drew them towards romantic scenery—were aroused and satisfied by the tale of Byron's pathetic end.

It was, however, in Emily Brontë that the influence of Byron bore most rich fruit, The duality of Satanic ruthlessness, of demonic power, made fashionable by Byron, was taken to its fullest height of expression by Emily Brontë, in the most Byronic figure in all literature—the hero of Wuthering Heights.

With Heathcliff, indeed the Byronic hero reaches his climax. The singularity of Heathcliff, stems from the fact that, presented as a character in a work of fiction, the whole conception was on the poetic plane. Never before in a novel had a voice been heard to Cry as he Cried to the dead Catherine :

'Catherine Earnshaw ! May you not rest as long as I am living ! You say I killed you—haunt me then ! Be with me always—take any form—drive

me mad ! Only do not leave me in the abyss, where I cannot find you ! ..I cannot live without my life ! I cannot live without my soul !'

Once before a similar voice had been heard in poetry, and it was Byron's Manfred crying to the dead Astarte :

"Yet speak to me ! I have outwatch'd the stars,
And gazed over heaven in vain in search of thee.
Speak to me ! I have wander'd over the earth,
And never found thy likeness – speak to me !
Speak to me ! though it be in wrath ;—but say
I reck not what but let me hear thee once
This once—once more."

In every aspect Heathcliff resembled the Byronic models. His very origins remain a mystery. Picked up in the streets of Liverpool, starving and homeless, 'as good as dumb' by Mr Earnshaw and brought home to Wuthering Heights under his cloak with no other explanation to his wife than the dubious words : 'You must e'en take it as a gift of god : though its as dark almost as if it came from the devil.' Who he was or where he came from is never revealed. Had Emily so wished, she could have given a rational explanation of the child's presence. But she did not wish it. She wished to surround every phase of his life with mystery, to spread a supernatural aura about him from the first.

Together with the sense of mystery of his origins, in Heathcliff is embodied the sin of pride as a natural corollary. He alone has a sense of what he is, and of what is due to him, to a Satanic deegree. He was not so much in retribution for the physical suffering he endured at Hindley's hands, as for his wounded pride, that he planned his revenge : pride entered into his love for Cathy, which was an aspiration towards the highest possession within his range. To be rendered unfit for her—systematically degraded in her eyes by Hindley—was to have a curse laid on him for life. Catherine's rejection of him, declared in his hearing, because she felt it would degrade her to marry, him, was teachery in his eyes. Since she loved him, she owed him love's allegiance ; he saw it in no other light. The sense of his own greatness of spirit, and her failure to recognise it, was the cause of his bitterest suffering. For this failure on her part he damns her on her death-bed : Why did you despise me ?' he cries. Why did you betray your own heart ? I have not one word of comfort : you deserve this. You have killed yourself.....you loved me—then what right had you to leave me ?...for the poor fancy you felt for Linton ? Because misery, degradation and death, and nothing that God or Satan could inflict would have parted us. You, of your own will, did it.

I have not broken your heart'—

He is cruel ; cruel in his revenge, passion-swayed in his love for Cathy and unrelenting in his supercilious contempt for Earnshaw and Linton. But he is no monster ; he is a piece of primordial energy. Heathcliff demanded as his due the best thing that came within his orbit—Catherine's love ; baulked of it, he became a devil. But never did he lose the consciousness of his seraphic essence, any more than did Lucifer. Quite rightly Emily makes us enter into his heart and mind, and espouse his cause, making us feel the justice of his claims, the poverty of Catherine's motives in betraying him. Heathcliff is always great, whereas she is paltry.

The aspiring mind is the Byronic element par excellence. In this domain, Emily was his equal. It is Heathcliff's daring that raises him to the level of Lucifer who proclaimed :

Nothing can quench the mind, if the mind will be itself. And centre of surrounding things—'tis made to sway.

To make the mind its own centre, to shape one's own destiny, is power supreme ; so Lucifer thought. And so Emily understood it when she left Heathcliff to direct his end. Notable is it that he makes no use of human agency, no intervention of Man or Nature, to bring about his death. Heathcliff is master of his fate. Alone, unaided, he makes his escape from the tormenting life.

No death in fiction is more hallucinating, more compelling on the reader, than his, none probes more deeply than his self-induced cessation from living, his escape from the bondage of the body into the limitless realm of Eternal life.

As a man, Byron far outstripped Emily in the range of his human experience, in learning and culture ; but in spiritual daring, she ventured beyond him. Whereas Manfred's death left the observers shuddering with horror, and the Abbot crying : 'H'es gone—his soul hath ta'en its earthless flight wither I dread to think...', Emily Brontë leads us to the grave of her lovers—the grave that Heathcliff desecrated the night after Catherine's funeral, to tear her out of her coffin and hold her once more in his arms—and there in the words of Lockwood closes all in blessing.

"I lingered round them, under that benign sky ; watched the moths fluttering among the heath and hare-bells, listened to the soft wind breathing through the grass, and wondered how anyone could even imagine unquiet slumbers for the sleepers in that quiet earth."

Editorial

Regret

We regret, we have not yet been able to catch up with the time in so far as the publication of this magazine is concerned. Decision on the selection of a printing press was of course this time one of the main causes of the delay. We have lagged far behind the schedule. And sizeable difficulty is being felt to make up the leeway and remove the backlog of facts and events. We, therefore, propose here to cover the entire back period in this issue of the College periodical so that the next number may be a current one. We crave the indulgence of the readers of and all concerned with the College Magazine for this abridgement. We only hope that we would be pardoned for this.

Obituary

Since we editorialised last our college suffered irreparable losses due to untimely demise of Prof. Ram Krishna Iyer and Prof. Prithwis Raychaudhury. Both of them served the College for a long time. Prof. Iyer's sound knowledge in his subject, his interest in teaching, his regularity in attendance in the college even after his onerous office works earned the respectful admiration of all concerned.

Prof. Prithwis Raychaudhury was truly one of the luminaries in the teaching staff of college. His interest in the college knew no bounds. He was associated with the college in more capacities than one. For several terms he was one of the Teachers' representatives to the Governing Body of the college, Secretary to the Teachers' Council and also the President of the College Students' Union. His zeal for and zest in the betterment of conditions for learning, teaching as well as non-teaching service in the college, his humane and cordial approach to the problems of all afflicted or aggrieved and his sincere efforts to get equity and justice for them really endeared him to all he was associated with. We gratefully remember that he embellished our College Magazine with many a well-written article.

The college held condolence meetings to bemoan the sad demises of the professors and sent messages of condolence to the bereaved families.

The world of arts and literature doubtless became poorer due to the demise of the renowned litterateurs like Narayan Ganguli, Tarashankar Banerji, Saroj Kumar Raychaudhuri, the outstanding painter like Jamini Roy. We gratefully and appreciatively remember the wealth of artistic creations they made to enrich our culture. We pay our respectful homages to the departed

souls and convey our sympathies to their bereaved relations. We bewail the loss of the famous Japanese novelist yasunari kawabata who committed suicide. He was a Nobel prize winner in literature.

Welcome

We extended our cordial welcome to the members of the teaching staff who in the meanwhile joined us in the field of imparting education to the students of this college and, generally speaking, in the diffusion of enlightenment in the land. They are Professors Dipan Chattopadhyay, Anupam Mukhopadhyay, Chandan Bhattacharya and Shankar Chandra Das. We believe that the students would verily be benefited by their learned teaching and to derive that benefit they would he respectful to the teachers so that they be really receptive in learning.

Govt. and Education.

Teachers of all categories of non-Govt. educational institutions in our country, more so in West Bengal, still suffer from various difficulties and disadvantages. Not all teachers get the benefit of what paltry amount of the subsidies in their salaries the Govt. provides. It cannot but be very much regrettable that the Govt. has not yet been able to decide on the matter of uniformity in the pay-scale of the college-teachers, nor even an appreciable upward revision of the same. What is far more deplorable is that the payment of the Govt. money is not at all timely. It is made several months after it is due. Another point in this connection that has already been brought to the focus time and again by all persons interested in the higher education of the country is the inordinate delay in the fixation of salaries of the college teachers newly appointed according to the U. G. C. scales.

The payscales of the non-teaching staff of the non-Govt colleges should also be rationally revised.

As a matter of fact no invidious distinction should be made between the staffs of the Govt. and non-Govt. colleges in not only the payscales but also in other facilities like pension, gratuity etc.

In all conscience, the differences in the payscales and other benefits for the same categories and qualities of service, Govt. or non-Govt. must be abolished and egalitarian principles strictly observed in a socialist state. The delay in this must not be allowed to be unconscionable.

Govt. grants for buildings, libraries, laboratories etc. for education at all levels, from the Primary to the University, ought to be proportionate and rational. The capricious and injudicious mode of allocating a huge sum of money for building and allied purposes of the wasteful, if not abortive, Higher Secondary Schools and not even a single rupee for the Junior High Schools

must be eschewed in no time. This has doubtless retarded the growth and upgrading of the schools of the latter type. If adequate subventions were provided to the Junior High Schools in the mean time, many of them might have been at least the ten-class high schools.

In the matter of foundation of new schools, Primary, Junior High, High or Higher Secondary, the Govt. observes the principle of imposing preconditions on the sponsors of or enthusiasts in education. And the preconditions are mostly difficult of fulfilment, especially in the rural areas where the people are either backward in education or are disintegrated for multifarious rsasons. The result is, more often than not, the reprehensible lack of progress in education in the country, bringing in its trails all sorts of retrogression all around. It is the duty of the Govt. to make a scientific survey in the entire country the need of education and thereafter sincerely endeavour to establish educational institutions of the requisite types according to situations. The matter of founding new institutions should not be left to the people most of whom are either indifferent or resourceless, The Govt., therefore, must make it a point to establish educational institutions of its own accord and to that end procure resources by any legitimate means. Education can no longer be kept in the cold shade of neglect which it has hitherto been. It is to be recorded that because of this negligence our land is still lagging in education behind many other countries which have made positively bold strides in a shorter span of time.

We suggest that the Govt founds also institutions of Fine Arts in at least the District and Subdivisional towns so that the young men and women in the suburban, semi-urban or rural areas may also have the opportunities for learning these arts and unfolding their talents according as they have proclivities. It goes without saying that for want of such facilities much of the aesthetic capabilities is suffering stupendous wastage. We should not be oblivious of the fact that the artistic qualities of and creations by the humans are by no reasons less important or valuable than the technical or scientific.

Up to now provision of aesthetic education exists rarely anywhere else than in the metroplises or renowned towns. Indigency prevents a large number of persons gifted with the talent artistic creations to seize the opportunities of training available there.

For more reasons than one facilities for education in aesthetic subjects should be decentralised as much as possible and that without dilatoriness.

Educational reforms

The human mind is in the interminable process of evolution. This is why the horizon of its knowledge is always widening. Both the subjects of knowledge and the methods for their attainment are, therefore, undergoing

changes at least from time to time. What is education but the adaptability of the inner faculties of the mind to the objective experiences gained from freshly obtained knowledge ?

Education, therefore, changes in its outlooks, systems and methods and calls for changes, at least, when the knowable contents, methods and means undergo tangible modifications. The principle, the system and the structure of education, demand some alterations in view of the changed set-up of the society. This means that education has to be reformed at times.

Education in our country also has undergone changes several times in the pre and post-independence era in the light of suggestions of educationists, and recommendations of Education Commissions etc. But these have not been up to the mark as yet. And reforms in education have only been half-hearted and desultory. More often than not paucity of funds is trotted out to be the reason for inability to bring about the much-desired full-fledged reforms. In consequence, India has to face a serious set-back on all fronts of prosperity. The loss due to retardation in education is staggering.

The University of Calcutta

We have some observations and comments on the affairs of the Calcutta University. This university was once the premier one in not only India but the whole of Asia. It was really the glory of the entire world of education. In the vast expanse of its geographical area, in population, and, above all, in the advancement of learning, briefly, both in quantity and quality, the education imparted by the University had hardly any equal anywhere. But, to the regret of all lovers of education, it has now bogged down to a deplorable state. Admitted that the general condition all around is at present in the throes for renascence or a new birth of social conditions, yet the miserable state of affairs in the University of Calcutta beggars description. The teaching, the learning in it have been lifeless. Its entire range of administration has been vitiated by groupism, party rivalries and some other pettifoggeries. All these and a host of many other lacunae there lead any sensible person to think that this giant institution has been beset with utter anarchy, chaos and confusion.

The thing that disturbs us most is the lack of the minimal sense of propriety and of duty in regard to the framing of syllabi for different courses and the publication of text books prescribed for studies by the students. For the last ten years or so the time span for studies in the colleges and the university has been sizeably shortened. But there seems to be scarcely any awareness of the syllabus-making bodies of this. The syllabi continue to be cumbersome and somewhere showily but unnecessarily complicated. Besides,

they are, to a great extent, stereotyped, montonous and jejune. Hardly any fresh and lusty outlook is visible anywhere in this field.

In the area of publication of text books by the University the less said the better. The most despicable part of the affair is that some text books of the University prescribed for studies for different courses remain out of print for years together. Vaisnav Padabali and the Sakta Padabali—the two anthologies of medieval Bengali poetry meant for the Pass and Honours in Bengali, may, interalia, be cited as illustrations in point. And the University continues to prescribe them even when it cannot publish the same in time. Can anything in this connection be more ridiculous and ludicrous? Some recent publication of textbooks Gadya Sanchayan for instance have replaced some old ones without in the least, any change for the better. Their editing seems slipshod, erratic and short-ranged.

All these irrefutable flaws in the University call for urgent and thorough overhaul of the University in all its spheres of activities. Strict and rigorous discipline must be enforced to sweep away all sorts of malpractices and malefactions like favouritism, nepotism, coterieism, indolence, irresponsibility and the air of apathy and unconcern. The administration should be toned up with strong hands but without undesirable interference with the spirit of autonomy laid down in its constitution. And for this right and worthy persons endowed with sense of idealism, moral scruples, knowledge and experience of action have to be saddled with the responsibility of running the administration. All workers of the University, regardless of their status, should be penalised if they are found inefficient and demoralised.

The Examination

To all intents and purposes there must be assessment of the merits of of the students at all stages. But the assessment has got to be just, proper and unbiased. In any scheme of reforms in education, the system of evaluaof the students' knowledge should also be reckoned. And new techniques for assessment have to be evolved or devised if the old system or methods prove effete, worthless or unjust.

Throughout the length and breadth of our country the old system of assessment or examination has been in a perfunctory condition. There have been immense talks, discussions, suggestions about the need of change in the system but no tangible shape has yet been given to them. And the thing continues to be in the rut. One knows not how long will the rot be allowed to go on. For any solution of the problem the educationists, the teachers and the students must sincerely and seriously endeavour. But so long as a new system of exam is not formulated the existing one syould be

broadbased on discipline. And the examinees in their own interests and in those of the country must come forward to shoulder the responsibility of observing that discipline. The authorities concerned should also instil this sense of discipline and responsibility in the students and also invite the the mature sections to share responsibilities in administration and management wherever and to the extent plausible and possible.

Centenaries

Paying respects and homages to the great and beautiful things in life and the universe, doing obeisance and reverence to the generous and magnanimous souls, the persons who consecrated the best of their life and activities, even to those who sacrificed their petty personal interests and abnegated self-aggrandisement for the upliftment of humanity—is an essential part of human culture and civilisation, a substantial portion of the ethical entity of the humans.

This is the reason why the civilised people all the world over from the hoary past adopted the custom of observing the days of birth and death of the high souls after their demise. This custom is not simply a formal ritual but a means of expressing heart-felt gratitude to the saints and savants. Moreover, those occasions provide inspiration and encouragement to people to be initiated with their teachings and mode of living. Thus the flame of humanitarianism, the divinity in man is kept unextinguished and the rich traditions of the human society are preserved. If the society is to be saved from annihilation, if it is to march forward on the path of peace, progress and all-round prosperity then surely the traditions and cultures that contain eternal verities and beneficent values must be preserved and nourished very fondly. To seek to demolish or blot out these riches will be to go back to the quandary and wilderness of barbarities of the primeval human existence.

In the last number of the College Magazine we appreciatively noted the birth and death centenaries of several pre-eminent men which fell in the year, 1970. We now note that the years, 1971 and 1972 also were the centennial years of birth of some and death of some other outstanding personalities of the human society. We reverentially remember with abiding gratitude and reaffirm our impeccable faith on the enduring contributions they made to the museum of human cultures.

John Amos Comenius, simply known as Komensky, was one of the greatest educationologists of the world. His thoughts on theories and practices of education are really wonderful. Many of these may still be drawn upon Comenius (Komensky) was born in 1592 and died in 1671. 1971 is therefore the death tricentenary of Komensky.

The year 1972 is being observed as the birth bicentenary of Raja

Rammohan Roy,a great social and and religious reformer and the harbinger of modern epoch in India. On more walks of life than one Rammohan was a path-finder, a messenger of truth and justice. His mode of rational thinking and balanced views of things created a new environment of culture in West Bengal which subsequently brought about a rich and fresh harvest of social, religious and political thoughts as well as of arts and literature. His contribution to Bengali literature, especially, prose in its formative period is almost immeasurable.

1971 is the birth centenary year of Abanindranath Tagore. He was certainly one of the illustrious sons of India. By his creative works of fine arts, painting, sculpture etc. he added fresh feathers of glory to the cap of India. Although familiarly acquainted with the western techiniques of fine arts, he never blindly imitated them. Curiously he delved into the opulent treasures of Indian arts and wisely invented a technique which was his very own. It was mostly due to him that a galaxy of artists, painters and sculptors, appeared in the firmament of arts in Bengal in his time and even after. His contribution to Bengali literature in sheer quality, in felicities of idioms and phrases, in pictorial fascination, in romantic suavity, in naive art of story-telling—is superb. All his writings need be made available to the readers without delay.

Surendranath Tagore, son of Satyendranath, was another great son of Bengal. He also was a revolutionary thinker. And his actions were not in any way discordant with his thoughts. His contributions to Bengali literature, political and economic thoughts and actions of his time cannot but be regarded as highly appreciable. It is sincerely desirable that all his writings should be republished and made available to the reading public. His birth centenary is in 1972. We sincerely wish that his contributions be recollected in all reverence and gratitude.

Sri Aurobindo Ghosh was one of the stalwarts among the freedom-fighters of India. By his journalistic writings he enkindled and kept aflame the spirit of patriotism and the love for liberation. But after some time he gave up the political pursuit and entered into the life of meditation. It seems that from the life human in politics he embarked on the quest of 'life divine', that is, the comprehensive life. He turned a great spiritual philosopher and a sage poet after this. His literature of this time abounds in mystical visions and feelings. Although the main fountain-head of his spiritual philosophy is the Upanishads yet he has welded that up into an original one by the assimilation of some neo-humanistic concepts. The hundredth year of his birth is 1972 The year should, therefore, be augustly observed by commemorating his thoughts and activities too.

The year of 1972 is remarkable also from an institutional standpoint.

As Bengal National Theatre, the first modern public stage of theatre in India was established in 1872, the present year becomes its centenary year. It is to be recalled that this theatre was really a landmark in the cultural progress of Bengal, nay, of India as well. The high vistas of dramatic performances were opened up before the nation. And what did it mean ?—It meant that the arts of dramatic literatures, the stagecraft, the theatrical music, the choreography, the histrionic art—all these and many other allied matters got great impetus to grow up This great occasion provided immense prospects to the audience to derive wisdom and delight from the vivacious enactments of ideas, thoughts, sentiments, feelings and facts. The entire nation should, therefore, wake up to the necessity of recalling the occasion's mighty achievements reaped subsequently. Exhibitions have to be organised to show the evolution and progress of the theatrical and dramatic arts and literatures throughout India so that the people may be enlightened and be cognisant of the mightiness of the epoch-making event.

We now conclude after giving our cordial thanks to all who lent us their assistance in publishing this issue. Special mention needs be made of the unstinted and ungrudged help received from Prof. Dipon Chattopadhyay who selected some of the articles of the students and made necessary corrections, read and corrected many of the proofs and contacted the printing press for the expedition of publication We are very glad to note that this time the Press (which is Kalika Press) has been quite co-operative. We heartily thank the press for this.

We are now looking forward to the current issue of the Magazine and if everything concerned goes well with us we propose to publish the next number before the ensuing puja recess. May the Infinite Supreme benevolent power help us !

The Contrast

Prof. Dipan Chattopadhyay

Let us sit on this lonely Maidan bench.
On one side are cars whizzing by,
The trams rattle on, the omnibuses roll—
On the other an expance of calm content.

* *

We stand at the fringe of two extremes—
We stand on the border of yes and no ;
The desires of our hearts are demure & shy,
Words of bravado we can hardly resist.

You and I

Shantonoo Ganguly

1st year. com.

You and I,
One and one makes one.
Closer it brings you,
This eternal truth, to me
And I follow my predecessors.
I feel the warmth of your body
Which is as warm as
Green grass kissed by the
Sunrays at dawn in the summertime,
And as refreshing as the zephyr,
As abundant as the sunrays,
It files along with my thoughts ;
To force me to witness
My past life. Suddenly
It reaches the destination.
I see my mother's body with
Her soul in it.
I wss gifted with the
First touch of warmth by her.
I get puzzled. Forgetting
The difference, which is small,
So small, that can be neglected,
I become blind the perfect eyes withal
And sqeeze your body
To extract the same thing as I did
When I was a stranger to this world,
Forgetting what the years,
Linking the two phases.
My childhood and manhood,
Did to me.

Deep craze for resemblances

Santonoo Ganguly

1st year. com.

A scarmark on the wall.
A scarmark on the
Wall I discovered when
I first met you.
Every romantic mind
Experienced with the
First l'amoure,
Is crazy after resemblances
And so the scarmark resembled your
Face, the wing of a butterfly,
As the clouds did and do.
Deep craze brought your mien
Everywhere, and now
In my mind and I see
Your face
Everywhere.

"अनुशासन और शिष्टाचार"

नन्दलाल मोहता बी काम प्रथम वर्ष (वाणिज्य)

शिष्टाचार सभ्यता का प्रतीक है। जो व्यक्ति, समाज या जाति जितनी ही सभ्य होती है, उसमें शिष्टाचार उतनी ही अधिक मात्रा में होता है। किसी बड़े-लिखे सभ्य तथा कुलीन के घर में आप जाइये, आप देखेंगे कि बड़े तो बड़े छोटे बच्चे सौम्यता, शान्ति, सशीलता की मूर्ति है। क्यों? इसलिए कि उन्हें शिष्टाचार के साधारण नियम सिखाये गये हैं, जैसे—किसी अपरिचित के घर में आने पर उसका अभिवादन करना या भाई-बहनों का आपस में न लड़ना, अपनी-अपनी पुस्तकों तथा कपड़ों आदि को निश्चित स्थान पर सफाई तथा सुव्यवस्था से रखना आदि। शिष्टाचारी होने के लिए आत्म संयम तथा आत्म निग्रह की आवश्यकता होती है। अनुशासन दो प्रकार का होता है। एक तो अपने ऊपर शासन करना अर्थात् इन्द्रिय दमन तथा मन को काबू में रखना और एक अनुशासन दूसरों के द्वारा होता है। सर्वोत्तम और पवित्र अनुशासन तो आत्म अनुशासन ही होता है। किन्तु बाह्य अनुशासन भी अति आवश्यक होता है। बाल्यावस्था में विशेष रूप से माता-पिता, गुरु जनों तथा बड़ों का अनुशासन होता है और होना भी चाहिए। बात यह है कि इस आयु में ज्ञान और अनुभव बहुत कम होता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान बहुत कम होता है। यदि माँ-बाप तथा गुरु आदि बच्चों पर अंकुश न रखें तो उन्हें बिगड़ते देर कितनी लगती है? यह सत्य है कि बच्चों को बड़ों का हस्तक्षेप बुरा लगता है किन्तु हम भूले नहीं हैं कि कड़वी कुनैन खाने के बाद ही जूड़ी बुखार जैसे भयंकर रोग से मुक्ति मिलती है।

मनुष्य भी एक समय में पशु सा जीवन व्यतीत करता था। सभ्य होकर आज वह इतना ऊँचा हो गया है किन्तु आज भी मानव में देवता और दैत्य दोनों निवास करते हैं। पशुत्व और देवत्व को सम्मिश्रण ही मनुष्य है। अतः पुरानी पशु-प्रवृत्ति मनुष्य के साथ थोड़ी बहुत लगी ही रहती है। आखिर स्वार्थ, व्यभिचार, चोरी, चुगली आदि क्या है? सभ्य से सभ्य मानव के अन्दर भी कुछ कमजोरियाँ होती है। यह आखिर क्या है? यही उसकी दानवता है। इसी पर पर्दा डालने के हेतु तथा देवत्व के विकास के लिए हमें शिष्टाचार का पल्ला पकड़ना पड़ता है, अनुशासन की सहायता लेनी पड़ती है। गृहस्थ जीवन, सामाजिक क्षेत्र तथा राजनीति के दायरे में, स्वार्थ परमार्थ, व्यक्तिगत विकास तथा राज्य संचालन आदि सभी की सफलता के लिए मनुष्य अनुशासन पर निर्भर करता है। छोटा-बच्चा जब पढ़ने बैठाया जाता है तब उसे विद्या जहर लगती है और बड़ों को उसे ठेल-ठेल कर पाठशाला में भेजना पड़ता है।

पन्द्रह वर्ष पहले की बात है कि एक कुख्यात डाकू गिरफ्तार हुआ। उसे फाँसी की सजा हुई। उसकी अन्तिम अभिलाषा पूरी करने के लिए उससे उसकी माँ से भेंट कराई गई। उस समय उसने अपनी मां का कान काट लिया। उपस्थित अफसरों को अति आश्चर्य हुआ। डाकू ने शान्त भाव से उत्तर दिया "बचपन में मैं एक बार पड़ोसी की कोई चीज उठा लाया था। मेरी मां ने यदि उस समय ऐसा करने पर दण्ड दिया होता तो आज मेरी यह दशा न होती। माँ ने वह चोरी की वस्तु उठाकर रखली थी। उस अज्ञानावस्था में यह प्रोत्साहन था जिसका फल यह हुआ कि मैं भयंकर डाकू हो गया "आपने देखा कुशासन का कुप्रभाव छोटे तो छोटे बड़ों पर भी यदि अनुशासन न हो तो उनके बिगड़ने में देर नहीं लगती। घोड़े को यदि गन्तव्य स्थल पर पहुँचाना है तो दो उपाय हैं—या तो उसे मार्ग पर दाना-चारा आदि का आकर्षण देते हुए आगे बढ़ाते जाइए या कोड़े की मार द्वारा आगे बढ़ाते जाईए। इसी सिद्धान्त पर तो हमारे महर्षि ने स्वर्ग और नरक की कल्पना की है यदि तुम धर्म तथा पुण्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि पाप मार्ग पर चलोगे तो नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा।

"हिन्दू-धर्म में प्रत्येक कर्तव्य, स्वास्थ्य, प्रदायक कार्य, लाभप्रद भावना आदि का करना 'धर्म' के नाम से कहा गया है। इस धर्म की आधार शिला क्या है? अनुशासन।"

"आज हम में शिष्टाचार तथा अनुशासन का अभाव सा प्रतीत होता है। हम बहुत सो चुके। अब जागने में ही जाति, समाज तथा राष्ट्र का कल्याण है।

॥ राजभाषा की अग्राह्यता ॥

श्री शिवप्रसाद पाठक "विशारद"

"बी० ए० द्वितीय वर्ष"

आज सारे देश में "हिन्दी दिवस" बड़ा धूम-धाम से मनाने का आयोजन किया है। हिन्दी दिवस हिन्दी प्रेमियों के लिये एक राष्ट्रीय पर्व की तरह महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन १४ सितम्बर १९४९ को हिन्दी देश की राजभाषा घोषित की गई थी। तथा यह निश्चय किया गया था कि १५ वर्ष बाद हिन्दी का राजभाषा के रूप में व्यवहार किया जायगा। भारतीय संविधान के अनुसार आज २१ वां वर्ष भी प्रायः समाप्त हो चला है। हिन्दी राजभाषा के रूप में व्यवहृत हो इस पेतु भारत सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

सन् १९५२ में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आयोग के प्रतिवेदन पर संसद में विचार विमर्श के पश्चात् २० संसद सदस्यों की एक समिति गठित की गई। जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति को परामर्श देना था। किन्तु उसका भी आज कुछ पता नहीं कि वह संसद सदस्यों की समिति कहाँ गई क्या परामर्श दी। इसके पहले महात्मा गाँधी हिन्दी को राजभाषा घोषित कर चुके थे। साथ ही यह भी कहे थे, कि हिन्दी का राजभाषा न होना राष्ट्र का गूंगा होना है। इनके अतिरिक्त राममोहन राय, आचार्य केशव, पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महर्षि दयानन्द सरस्वती, पं० मदनमोहन मालवीय, डा० राजेन्द्रप्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा दक्षिण भारत के अन्य हिन्दी प्रेमी नेताओं एवं देश भक्तों ने भी हिन्दी के विकास के लिए कम नहीं किया। भारत के शीर्ष वयोवृद्ध नेता श्री सी० राजगोपालचार्य को हिन्दी के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त है। वर्तमान समय में भी कई नेता एवं देशभक्त इसके पक्ष में हैं किन्तु उनकी दाल नहीं गलती है।

सबसे दुःख की बात यह रही कि इसी बीच हमारे राजनीतिक दलों ने जो अपना उल्लु सीधा करना चाहते हैं दक्षिण भारत में हिन्दी के विरोध में हिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति को गहरी क्षति उठानी पड़ी और हिन्दी की भी प्रगति रुक गई।

कुछ ऐसे हिन्दी भाषी राज्य हैं जो हिन्दी का प्रयोग आधीकाधिक रूप में कर रहे हैं ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब हरियाणा राजस्थान, बिहार, दिल्ली हैं। प्रसन्नता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल में लोग बड़ी लगन एवं जोर-शोर से हिन्दी सीखने में व्यस्त है। किन्तु

कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ सम्पूर्ण कार्य-काज अंग्रेजी में किया जाता है जैसे केरल, मद्रास, आन्ध्रप्रदेश, तामिलनाडु इत्यादि।

अतः जिन लोगों पर हिन्दी को राजभाषा के रूप में व्यवहृत कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था वे असफल एवं नाकामयाब सिद्ध हो चुके हैं। अब उन पर आश्रित रहना हमारी मूर्खता होगी। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा घोषित हो चुकी है। इसके व्यवहृत कराने में जो अवरोध है उसे दूर कराने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, ताकि भारत सरकार को दबाव डाल सकें कि वह हिन्दी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करे।

अतः मैं अन्त में यह कहूँगा कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित कराने के लिए प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी संकल्प ग्रहण करें।

अमेरिका पाकिस्तान के मध्य बंगला देश

शिवप्रसाद पाठक कला विभाग

द्वितीय वर्ष

यह आश्चर्य और दुःख का विषय है कि २५ मार्च १९७१ से पाकिस्तान द्वारा "बंगला देश" पर नरसंहार किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप ९० लाख पाकिस्तानी भारत में शरण ले चुके हैं और अभी कितने आयेंगे कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इस वजह से भारत में प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल और आसाम की स्थिति एवं कानून व्यवस्था दिन प्रति दिन अस्त व्यस्त होती जा रही है।

किन्तु आश्चर्य इस बात पर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार तथा साज समान देना बन्द नहीं किया। बल्कि जारी रखा है। यद्यपि अमेरिका स्वयं यह घोषित कर चुका है कि "बंगला देश" में हुए "नर संहार के बाद उसमें पाकिस्तान को सामरिक सहायता देने में प्रतिबन्ध लगा दिया है। किन्तु २२ जून १९७१ को "न्यूयार्क टाइम्स" अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सामरिक सहायता चालू रखने का सनसनी पूर्ण रहस्योद्घाटन किया था उससे अमेरिका की चोरी पकड़ में आई है।

'सुन्दर वन एवं पद्मा नामक दो जहाजों में अमेरिका ने हथियार एवं समान भेजने के बाद कहा कि यह २५ मार्च को पूर्व हुए समझौते के अनुसार जहाज करांची के लिये रवाना हो गये थे। लेकिन उसकी बात भुला दीजिये। उसके बाद भी उसने तीन जहाज सामान भेजा। क्या इसे भी पूर्व समझौता कहा जा सकता है नहीं, यह अमेरिका की चाल मात्र है, जो ऊपर से विश्व जनमत को आंखों में धूल झोंकना चाहता है।

वर्त्तमान स्थिति में पाकिस्तान को भेजे गए इन हथियारों का इस्तेमाल कहाँ होगा? इसकी जानकारी अमेरिका को भली भाँति है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान ऐसे हथियारों का उपयोग बंगला देश में नरसंहार जारी रखने अथवा भारत के साथ उत्तेजनात्मक आक्रमण करने के लिए करेगा।

एक ओर अमेरिका में बंगला देश के उद्वासित तथा पीड़ित लाखों शरणार्थी के लिए कुछ औषधि और सहायता सामग्री भेजकर उनके आँसू पोंछने की चेष्टा की है तो दूसरी ओर पाकिस्तान के फौजी तानाशाही के हाथ में युद्ध का सामान देकर बंगला देश की निरस्त्र जनता की

हत्या करने का भी प्रबन्ध कर दिया है। अमेरिका की इस दो तरफी नीति से कौन क्षुब्ध और कुपित नहीं होगा।

यह भी सर्वविदित है कि अमेरिका सन् १८५२ से ही पाकिस्तान को कम्युनिष्टों को खिलाफ युद्ध करने के लिए शस्त्रों की सप्लाई करता आ रहा है। किन्तु अमेरिका ऐसी स्थिति में सामान एवं हथियार भेज कर मानवता का बहुत बड़ा अहित किया है।

अगर द्वितीय महायुद्ध के दौरान किसी लोक-तन्त्रवादी देश ने जर्मन तानाशाह "हिटलर" को सामरिक एवं आर्थिक सहायता दी होती तो उस समय उसकी क्या प्रति-क्रिया हुई होती? जिस प्रकार यहूदियों का उन्मूलन हिटलर ने किया, उसी प्रकार बंगालियों का उन्मूलन पाक राष्ट्रपति जनरल "याह्या खाँ" ने भी किया। जिसप्रकार पाकिस्तान में रोमांचकारी एवं दर्दनाक काण्ड जनरल याह्या खाँ ने किया ऐसा इतिहास में अभी तक नहीं पढ़ने को मिला है।

किन्तु अभी भी "बंगलादेश" पर लिए जा रहे नग्न एवं बर्बरता पूर्ण आक्रमण देखकर भी पाकिस्तान को फौजी सामान देना जारी रखा है।

इसके विरोध में कलकत्ता एवं दिल्ली स्थित उपायुक्त के सामने लाखों भारतीयों ने प्रदर्शन किये। जो सभी को विदित है, और 25 जून को "बंगलबन्द" का आह्वान "बंगलादेश को मान्यता दिलाने के लिए किया गया था। यह भी सर्व विदित है।

१३-१४ सितम्बर को हमारे लोक सभा के अध्यक्ष श्री ढिल्लो स० राष्ट्रसंघ की बैठक में भाग गए जहाँ बंगल देश पर हो रहे अत्याचार का स० राष्ट्रसंघ की बैठक में हटाया और उन्होंने वहाँ माँग प्रस्तुत की एवं अन्य राष्ट्र इसकी गम्भीरता को समझें और बंगला देश के मामले को राजनीतिक रूप में हल करने का प्रयास करें। परन्तु हमारी आवाज ढाँढ खाने की गप्प बनकर रह गई अखिर हुआ वही जो मंजूरे खुदा था। पाकिस्तान की बरबंता सीमा पार कर गई और बंग भूमि में गगन वेधी ठोपें गरज उठी। निक्सन सरकार की भी कलई खुले बिना न रही। और बात बड़ी रात भर मिमयानी बासी हुई। बंगोप सागर में अमेरिकी सातव बेड़े की उपस्थिति के साथ बंग बंधु मुजीब का स्वप्न साकार हो गया। बंग बंधु जिन्दाबाद।

मेरी प्रिय

मंगल लाल शर्मा (दार्शोच)
बी०काम० प्रथम वर्ष बिल्ठाई,
रो० न० 910

मैं छोटा स बच्चा थी। तब देखता था कि प्रायः सभी के एक एक थी। अपने परिवार वालों को देखता तो दादा जी के, पिताजी के, चाचा जी के तथा मेरे बड़े भाई के थी! प्रायः बहुत से बड़ी उम्र वालो के थी। मैं उसे उनके पास देखता तो बहुत खुश होता! क्योंकि उसके होने से वेलोग और भी ज्यादा सुन्दर लगते थे। मैं मन में सोचता कि अभी बच्चा हूँ। बड़ा होने के बाद एक मेरे पास भी होगी।

जब मैं ग्यारह साल का हुआ तो मुझे भी उसकी इच्छा हुई। पहले तो सोचा करता था मेरी उम्र वालों के नहीं है। मगर अब तो मेरे दोस्त के भी आ गई। वह उसको साथ रखता। मैंने उसके पास देखा तो मेरी इच्छा और भी ज्यादा हो गई। मैं उसके लिए तड़फने लगा। मुझे नींद में भी वह दिखने लगती। मैं उसके बिना न रह सका। एक दिन पिताजी के सामने मैंने भी उसके लिए प्रस्ताव रख दिया। पिताजी मुस्कराये तथा कहा "तुम तो अभी बच्चे हो। ऐसी चीजों की क्या जरुरत। आदमी को सादा जीवन तथा उच्च विचार रखने चाहिए"। मैंने हठ नहीं छोड़ी।

आखिर एक दिन पिताजी ने मेरे लिए···· ला दी मैं बहुत खुश हुआ! मैं बहुत खुश हुआ! मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब मैं भी दूसरों की तरह चौबिस घन्टे उसे अपने साथ रखता हुं। मैं उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करता। खाना खाता, घूमने जाता, रेस्तरां में पार्टी में भी, यहां तक कि सोता तो भी उसे अलग नहीं करता।

मेरे दोस्त भी उसकी बहुत प्रसंसा करते हैं। कहते हैं बहुत सुन्दर है। किसी पार्टी में जाता हूं तो मैं उसके होनेसे बड़े गर्व से जाता हूं। वह मुझे बहुत प्रिय लगती है।

मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं उसे कहीं खो न दूं। बस में या ट्राम में हो टेक्सी में बैठता हूँ तो बैठते ही उसको देखता हूं। एक बार वह चल नहीं सकी तो उस पर मैंने कुछ रुपए भी खर्च किये! बताओ वह मेरी प्रिय क्या है! वह मेरी प्रिय ···घड़ी···है।

"ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे।" :—"अज्ञात"

"संगति का फल जरुर मिलता है।" —"कबीर"

समय का सदुपयोग

"घनश्याम दास अग्रवाल"
बी॰कम॰ फस्ट ईयर॰ई॰

जीवन की उन्नति के लिये समय का सदुपयोग करना अनिवार्य है। इसके लिये हमें कार्य-तालिका बनानी चाहिये। तलिका में निर्धारित समय के अनुसार काम करना चाहिये। इससे सभी कामों में सफलता मिलती है, और समयानुसार काम करने से कभी किसी काम का बोझ भी मालूम नहीं होता। कार्य तालिकामें विभिन्न प्रकार के कर्मों में उचित रूप से समय का विभाजन करना अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिये समय का सबसे अधिक महत्व है। स्कूल में तो समयानुसार काम होता है, पर घरों में भी समय तालिमा बना कर काम करना चाहिये और पढ़ने के समय पढ़ना चहिये। ऐसा करने से ही छात्रों की उन्नति होती है। कबीर ने कहा भी है।

"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।"
पल में प्रलय होयगी, बहुरि करोगे कब॥

कबीर की ये पंक्तियाँ सदा समय के महत्व की ओर इशारा करती रही हैं। वस्तुतः मानव जीवन सर्वोत्कृष्ट है। इसमें कबीर जीकहते हैं।

"रात गंवाई सोयकर, दिवस गँवाया खाय।
हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाय॥"

हम गाय-बैल पुस्तक, आदि का मूल्यांकन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष का मूल्यांकन करना असम्भव है। हमारे देश में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया। जैसे :—महात्मा गाँधी, पंडित जवाहरलाल नेहरु, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आदि। उन्होंने समत के एक क्षण को मूल्यवान समझ कर उसका सदुपयोग किया। वे कभी भी आलस्यवश नहीं बिताये। समय को महत्व देने वाला व्यक्ति ही संसार में यश प्राप्त कर सकता है। समय का अनुसरण कर मनुष्य अमर हो जाते हैं। आदमी आलस्य एवं भोग विलास कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं होता। ऐसे मनुष्य पशु से भी गये गुजरे होते हैं। समय की थोड़ी सी भूल मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाती है। जैसे ठीक समय पर किसी रोग का इलाज न करे तो छोटा रोग भी बड़ा हो जाता है। जैसे :—उचित समय पर किसान अगर कृषि न करे तो उसे साल भर रोना पड़ता है। थोड़े समय के लिये लखपति आदमी को भी व्यापार में

खाकपति बन जाना पड़ता है। समय के दुरुपयोग से धनी निर्धन एवं सदुपयोग से निर्धन धनी बन जाता है।

विद्यार्थियों के लिये तो एकएक क्षण का सर्वाधिक महत्व है। समया नुसार काम करने वाले विद्यार्थी हरदम खुशरहते हैं। समय वर्तमान के रूप में हमारे समक्ष आता रहता है, और बन कर निकल जाता है।

यह दुःख का विषय है कि हमारे देश में समय का घोर अनादर होता है। यहाँ कोई भी समय पर अपना काम नहीं करता है। प्रायः निर्धारित समय पर न कोई सभा होती है। न कोई आदमी अपने मित्र से मिलने जाता है। कार्यालय के अधिकारी गण एवं साधारण कर्मचारी अपने ठीक समय पर काम नहीं करते हैं। अधिकारी प्रायः विलम्ब करके कार्यालय जाते हैं। समय के इस महान अनादर को एक छोटे से अंग्रेजी शब्द इण्डियन टाइम, कह कर समाप्त किया जाता है। यह समय का ही नहीं इसमें देश का अपमान है। इस संसार में उत्तरोत्तर प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलने के लिये समय का सदुपयोग करना जरुरी है।

समय की क्षमता महान है। यह क्षण भरमें ही राजा गरीब और गरीब को राजा बना देता है। समह की गति रेलगाड़ी से अधिक तेज है। रेलगाड़ी रोकी जा सकती है परन्तु आज तक कोई भी धराधाम में 'माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो समय की गति को रोकने की सामर्थ्य रखता हो। अतः यदि अपनी शारीरिक मानसिक और अध्यात्मिक उन्नति करना चाहते है, और समाज तथा राष्ट्र की गौरव वृद्धि की कामना करते हैं, तो हमें सत्कर्मों को करते हुए अपने समय का अविलम्ब सदुपयोग करना चाहिये। समय के उपर संकेत करते हुए रहीम ने लिखा है कि :—

"समय लाभ सम लाभ नहिं, समय चूक सम चूक।
चतुरन के कसकत रहत, समय चूक ही हूक॥"

বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

ছাত্র-সংসদ

১৯৬৯—৭০/৭১

শ্রীসুধীর মুখার্জী, অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর (তদানীন্তন সম্পাদক, পত্রিকা), অধ্যাপক সুকুমার চৌধুরী, অধ্যাপক কমলা প্রসাদ ঘোষ (পত্রিকা পরিষদের সদস্য), শ্রীঅমর নাথ দত্ত (সম্পাদক, ছাত্র-সংসদ, পত্রিকা, ৬৯-৭০)।

দ্বিতীয় সারি: (বাম হইতে) শ্রীঅমিত ভৌমিক, শ্রীউৎপল কুমার সেন (ক্রীড়া সম্পাদক, ৬৯-৭০/৭১), শ্রীআশীষ বোস।

গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে—

শিল্পী : জিতেন্দ্র নাথ রায়

তৃতীয় বর্ষ। কলা বিভাগ।

'কলকাতা / ৭০'

উৎপল কুমার সেন

॥ বিজ্ঞান ॥

আমার মেয়ে-বন্ধুটিরে সরল মনে,
মিশতে দিলাম আমার সকল বন্ধু সনে।
দিন দশেক না পোহাতে,
চলে গেল সে বেহাতে ;
ডুবিয়ে দিয়ে আমায় 'ভালবাসার ঋণে' ॥

•

সকালে রক্-বাজী,
দুপুরে কলেজ।
বিকেলে পার্ক / কফি—
সঙ্গে নিয়ে লেজ।
রাতেতে রাজনীতির
চলে যে নলেজ ॥

হঠাৎ এগিয়ে এলো
ফাইন্যাল-ষ্টেজ।
না পড়েও বাজীমাৎ
সঙ্গে আছে পেজ,
নতুবা জানালা-চেয়ার
হবে যে ড্যামেজ ॥

•

ভোটে জিতেই দাদা-মশাই মন্ত্রী হতে চান
এদল, ওদল, সেদল করেও যদি তা' না পান—
রাষ্ট্রপতির শাসন এনে রাখেন নিজের মান ॥

•

একালের সাহিত্যে থাকা চাই স্ল্যাং,
স্ল্যাং বিনা নির্ঘাৎ খেতে হবে ল্যাং
বটতলা বাসীদের সমাদর খুব ;
সাহিত্যের আসর আজ জলহীন কূপ ॥

•

আশা ছিল মোর মনে :
লক্ষ্মীর মত কনে।
প্রয়োজন হ'লে পণ না লয়ে
কড়িতে লইব কিনে।
হায়রে অবশেষে,
প্যাঁচীই জুটিল এসে !
মরে গেল আশা, বেশী কিছু নয়—
মাত্র 'হাজার-বিঘে' ॥

একটি 'ভাল-লাগা'র মৃত্যু

উৎপল কুমার সেন

॥ বিজ্ঞান ॥

জানি না আমার এই আটপৌড়ে কাহিনী কোন্ সাহিত্য পর্যায়ে পড়ে কিনা। তার সাহিত্য হোক্ বা না হোক্ তাতে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেকের জীবনে প্রেম আসে বিভিন্ন রূপে। কেউ সে রসে পায় জীবনের নতুন আস্বাদ কেউ বা বিষাদ। কিন্তু যাদের জীবনটাই নীরস তাদের নিয়ে সাহিত্য করাটা সাহিত্যিক বুঝবে, সে ভার আমার নয়।

যাই হোক্, আমার নীরস জীবনেও রসের জোয়ার এসেছিল। সেই জোয়ারকে আমি বাঁধতে পারিনি হৃদয় দিয়ে। কোথায় যেন একটু ফাঁক ছিল—যে ফাঁক আমি আজও অনুভব করছি। আর সেই ফাঁকের অন্তরালেই আমার এ-কাহিনীর উৎস।

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বার হ'ল—দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। কিন্তু অবতীর্ণ হলাম সব চেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখে—কলেজ সমস্যা।

আমাদের মফঃস্বলে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাত্র একটি কলেজ—তাতে আবার ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে পড়ার ব্যবস্থা। যে ক'টা আসন খালি থাকে তা পূরণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা। তারপর সুযোগ আসে বেশি নম্বর পাওয়া দ্বিতীয় বিভাগীয়দের। কিন্তু উভয় দিক থেকেই আমি বঞ্চিত।

দ্বিতীয়-পথ কলকাতা। মফঃস্বলের ছেলে কলকাতা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। বাবা রাজী হলেন না আশী মাইল ঘুরে একা পাঠাতে। মনটা খারাপ হয়ে গেল—বাবার আদরের জন্যই আমার ভবিষ্যৎটা বোধহয় নষ্ট হবে।

অগত্যা একবার মফঃস্বলের কলেজ ঘুরে এলাম—যদি সুযোগ পাওয়া যায়। বৃথা—দিন কুড়ির আগে জানা যাবে না সুযোগ আসবে কিনা!

অবশেষে বাবার সাথেই রওনা হলাম কলকাতার পথে। কে জানতো ওখানে পরীক্ষার ফল বেরুবার আগেই ছেলে ভর্তি হয়ে যায়! না হলে মাত্র তিন দিন পরে গিয়ে কোন কলেজেই সুযোগ পেলাম না!

ঠিক সুযোগ পেলাম না বললে ভুল হবে—বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ এসেছিল কয়েকটা কলেজে। তবে বিজ্ঞান-বিভাগ ছাড়া অন্যটায় আমার আগ্রহ নেই। প্রথম কথা ইংরাজী সাহিত্যে আমি একটু কাঁচা; আর অঙ্কে আমার খুব আগ্রহ—হয়তো একটু সহজে

বুঝি বলে। তাই বিজ্ঞানে মাত্র এক বছর পড়ে কোন রকমে ইংরাজী সাহিত্যটা পার হতে পারলেই বাঁচি।

শেষ পর্য্যন্ত সে পথটাও পরিত্যাগ করতে হ'ল। বাবা পরামর্শ দিলেন টেক্‌নিক্যাল পড়তে, আমি অনন্যোপায় হয়ে রাজী হলাম। আমার পথেই বাবা কলকাতার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা পত্র নিলেন যাতে আমাদের ওখানকার পলিটেক্‌নিকে সহজে ঢোকা যায়।

আশী মাইল দূরে কলকাতাকে ফেলে আবার মফঃস্বলের পথে নামলাম। ফিরে এলাম লণ্ঠনের আওতায়। পরদিন ভর্তি হয়ে গেলাম সেই পত্রের জোরে 'পলিটেক্‌নিকে'।

সাইকেল করেই যাওয়া-আসা শুরু করলাম প্রায় পাঁচ মাইল পথ। খুব খারাপ লাগে একা একা যেতে—তার উপর উল্টো পথে সব ছেলে মেয়েরা কলেজে যায়। দিন পনের এইভাবে কেটে গেল।

প্রতিদিনের মত সেদিনও মন খারাপ করে চলেছি: প্রায় এক মাইল পথ যাবার পর পড়ল রায়পাড়া বাস-ষ্ট্যাণ্ড। কয়েকটা ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো স্কুলে বা কলেজে যাবে। সেদিন কিন্তু আর এগুতে পারলাম না—একটা সরল সৌন্দর্য্যের ছটা এসে আমার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাল। সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। এমনকি লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে রইলাম। এ যেন ভাষাহীন রূপ!

সেই রূপের বর্ণনা দিয়ে আপনাদের মতিভ্রম ঘটাতে চাই না। তবে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ষোড়শী-সৌন্দর্য্য আমার মতি বিভ্রম ঘটিয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করার আগেই কোথা থেকে একটা বাস বেরসিকের মত এসে সমস্ত রস ভঙ্গ করে সেই রূপ হরণ করে নিয়ে গেল। বাকী পথটা বেশ উৎফুল্ল মনেই অতিক্রম করলাম।

দ্বিতীয় দিনেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল, তবে কালকের চেয়ে আজকে বাসটা একটু দেরীতে এসে বাধা সৃষ্টি করল।

সারাদিন কেমন যেন আবেশের মধ্যেই কেটে গেল। রাত্রে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়াশুনা করছি—হঠাৎ রায়পাড়া বাস-ষ্ট্যাণ্ড শুনে বই থেকে মনযোগটা সেইদিকে নিবিষ্ট হ'ল। ছোট বোন দিদিকে বলছে—'জানিস্ দিদি একটা মেয়েকে প্রায়ই দেখি রায়পাড়া বাস-ষ্ট্যাণ্ডে। কি সুন্দর দেখতে!'

আরও কিছু শোনার আগ্রহে উৎসুক হয়ে উঠলাম। ওদিকে দিদি বকুনী দিয়ে উঠল—'কিরে পড়তে বসে মন কোনদিকে?'

তাড়াতাড়ি অঙ্ক বইটা খুলে অঙ্ক কষতে শুরু করলাম। এবার আর নিজের কণ্ঠস্বর শ্রবণেন্দ্রিয়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু শোনাবার উৎসই গতি হারাল—যাতে আমার মন-সংযোগের ব্যাঘাত না ঘটে।

পরদিন অবশ্য ইচ্ছা হ'ল ওর সাথে কথা বলার। তাই একটু আগেই বেরুলাম বাড়ী

থেকে। আমাদের পাড়ার বাস-ষ্ট্যাণ্ড অতিক্রম করতেই এক বন্ধু জরুরী কথা শোনাবার জন্য গতি রোধ করল।

—'এই, তুই কলেজে চান্স্ পেয়েছিস্।'—জরুরী কথা শোনাল বন্ধুটি।

তখন অন্য কোনদিকে মন দিতে খুব একটা ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু কলেজের কথায় একটু ভাবান্তর ঘটল। প্রশ্ন রাখলাম—'কিভাবে জানলি?'

উত্তর এল—'প্রথম ডিভিশনে পাশ করা অনেক ছেলে কলকাতা চলে গেছে, সেইজন্য দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে আরও কিছু ছেলে নেওয়া হচ্ছে। তোর নাম উঠেছে লিষ্টে।'

—'বিকেলে পাড়ায় দেখা করব।'—বলে তখনকার মত মুক্তি নিলাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সাইকেল থেকে নামলাম। কিন্তু তেমন কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই প্রাণ মাতান সৌন্দর্য্য! হয়তো চলে গেছে। বন্ধুর উপর রাগ হ'ল। অবশ্য তখনি আবার কলেজের কথা মনে আসল। একবার দেখেই আসা যাক্ আমার নামটা। হয়তো ওখানেই আবার খুঁজে পেতে পারি সেই সৌন্দর্য্যটাকে।

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম এতটা, সে পথ দিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম কলেজের দিকে—

.....অনেকটা দূর এসে পড়েছি। সামনের মাঠ পার হলে মেয়েদের স্কুল আর ডান পাশে একটু দূরে কলেজ।

স্কুল এখন শান্ত। বাঁ পাশের বাগান—যেখানে বড় বড় সব গাছের সারি প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থেকে নীচের ঘাসগুলোর সবুজত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে, সেদিকটাও জন-মানব শূন্য।

স্কুল অতিক্রম করে কলেজে ঢুকে দেখলাম লিষ্টে নাম আছে, সাত দিনের মধ্যে ভর্ত্তি হতে হবে। নাম তো খুঁজে পেলাম—কিন্তু শুধু নাম খুঁজতেই কি এতদূর এসেছি? আবার খুঁজলাম সেই হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য্যটা। অনেক রূপের দেখা পেলাম ইত্যবসরে। তবে কোনটাই সেই সরল সৌন্দর্য্যের পাশে রাখবার মত নয়। হয়তো ছিল—কিন্তু আমার স্মৃতির সেই অপরূপকে অতিক্রম করতে কেউ পারল না।

কলেজ থেকে বেরিয়ে স্কুলের গেট অতিক্রম করার আগেই আবার দেখা পেলাম। স্কুলের ফুল বাগানের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে সেই হারানো ফুল। আবার হারিয়ে গেল—কিন্তু খুঁজে আনব কি ভাবে? স্কুলের চারপাশের জাল টপ্‌কাবার অধিকার আমার নেই। তাই নিজের চারপাশে স্মৃতির জাল বুনেই চলে এলাম।

ঠিক করলাম কলেজেই ভর্ত্তি হব। এমনকি বাড়িতে না জানিয়েই কলেজে ভর্ত্তি হলাম—বিজ্ঞান বিভাগে; এদিক সেদিক থেকে টাকা যোগাড় করে। শুরু করলাম প্রতিদিন কলেজ যাওয়া, বন্ধুর বাড়ীতে পলিটেক্‌নিকের সাজ-সরঞ্জাম রেখে।

দিন তিনেক সাইকেলে গেলাম। তাই তিনদিনের মধ্যে কোনদিনই দেখা পেলাম না সেই রূপের। যার জন্যে কলেজে আসা সেটাই ব্যর্থ হতে চলেছে। সাইকেলটাও বন্ধুর বাড়ী

রেখে আসব সাব্যস্ত করলাম।

পরদিন থেকে বাসে যাওয়া শুরু হ'ল। দাঁড়িয়ে আছি বাস-স্ট্যাণ্ডে, দু'খানা বাস চলে গেল। কোনটায় তার দেখা পেলাম না। তৃতীয়টাও এসে গেল—হ্যাঁ, ঠিক জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে সে। উঠে পড়লাম। সত্যি বলতে কি এত কাছ থেকে আমার অষ্টাদশ বর্ষীয় দর্শনেন্দ্রিয় ইতিপূর্বে নিরীক্ষণ করেনি একসঙ্গে এত রূপ! ফর্সা কপালে লাল টিপে আর বুকের উপর দিয়ে যাওয়া সাদা শাড়ীর লাল পাড়ে ওর সুন্দর রূপটাকে আরও সুন্দর করে রেখেছিল। আস্তে আস্তে এসে পাশে দাঁড়ালাম। এক ফাঁকে দেখে নিলাম ওর নামটা বইয়ের উপর থেকে—রীণা ভৌমিক ; একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)।

চমকে উঠতে হ'ল, একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)। নিজের হাজ্-খাতাটায় একবার চোখ বোলালাম ; প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞান)। কেমন যেন সঙ্কোচ জাগল, ওর পাশে দাঁড়াবার কোন গুণই যে আমার নেই। বয়সে আমার চেয়ে ছোট মনে হচ্ছে অথচ পড়াশুনায় বেশ এগিয়েছে।

ধীরে ধীরে সে চিন্তাও মিলিয়ে গেল। প্রবল হয়ে উঠল কথা বলার অদম্য ইচ্ছা। চিন্তা মাত্রই একটা অভাবনীয় কাজ করলাম। সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও ওকে ইঙ্গিত করে বললাম—'কটা বাজে?'

আশেপাশে আরও কয়েকজনের হাতে ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নটা ওকেই করেছি। পলকে আমার মুখটা দেখে অতি সন্তর্পণে মনিবন্ধ ঘুড়িয়ে হাতঘড়িতে চোখ রাখল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'এগার।'

ভদ্রতা করে শুধু একটা ধন্যবাদ জানালাম। সেদিনের মত সেখানে সমাপ্তি।

ক্লাশে বসে দ্বিধা না করেই প্রথমে কাটলাম 'প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞান)' লেখাটা তারপর আমার নামটাও। খাতা উল্টে পেছনের মলাটের ভেতর দিকে লিখলাম—রীণা ভৌমিক ; একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)। জানি না ওটা লেখার মত প্রেরণা কোথায় পেলাম।

তারপরের দিন আবার নির্দিষ্ট বাসে উঠলাম আর এবার ভাগ্য যে ওর পাশের সীটটা খালি হল। দ্বিধা না করে বললাম—'বসতে পারি?'

ও সঙ্কুচিত হয়ে জানালার ধারে একটু সরে বসল। সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যদিও ঐ সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসাটাই সম্মতির লক্ষণ তবুও না বোঝার ভান করলাম।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও নিজেই বলল—'বসুন'। আবার চমক সৃষ্টি করল কথার ঝঙ্কারে!

বসলাম তার পাশে। সহজ হওয়ার জন্য আলাপ শুরু করলাম—'কাল ও ভাবে সময় জানতে চেয়েছিলাম বলে কি কিছু মনে করেছেন?'

মৃদু হেসে শুধু মাথা নাড়ল। আর বলার মত কোন কথা তো খুঁজে পাচ্ছি না। চুপচাপ

চলল কিছুক্ষণ। কিন্তু এত কাছে থেকেও যৌনতা ভাল লাগল না। আবার শুরু করলাম—'কলেজে পড়েন?' যেন একেবারেই জানি না।

এবারও মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল। কিন্তু আমি যে চাই ওর সুমধুর কণ্ঠস্বর আর বেশ শোনার পরও ভেসে বেড়াবে চারপাশে। আরও কিছু বলার আগেই বাসটা স্কুলের কাছের মাঠটায় পৌঁছে গেল। নেমে পড়লাম দুজনেই। একসঙ্গে পার হয়ে গেলাম মাঠটা। স্কুলের গেটের কাছে এসে ওকে বললাম—'আপনাদের টিফিন হয় কটায়?'

মৃদু স্বরে ভুলে ও উত্তর দিল—'দেড়টা থেকে আড়াইটে।'

দেড়টার ক্লাশ শেষ হওয়ার পর চলে এলাম স্কুলের গেটে। মেয়েরা সব এখন নানাভাবে তাদের অবসর মুহূর্ত কাটাচ্ছে। ওর দেখা পেলাম না কোথাও।

স্কুলের বাঁ পাশের বাগানে গেলাম। কলেজের ছেলে-মেয়েরা এবং স্কুলের মেয়েরা যে যার পছন্দ মত জায়গা বেছে নিয়ে গল্প গুজব করছে। কেউ বা নিজেদের একেবারে আলাদা রেখে পড়াশুনায় ব্যস্ত। চারপাশ ঘুরলাম, এ রাজ্যের আমি যেন অবাঞ্ছিত অতিথি; অনেকে বারেক চোখ বুলিয়ে আবার নিজের ব্যস্ততায় ডুবে যাচ্ছে। এখানেও সে নেই! ফিরে আসছি কলেজের দিকে—হঠাৎ কোণের রাধাচূড়া গাছের তলায় দৃষ্টি প্রতিহত হ'ল। একমনে কি যেন লিখে চলছে ও। পায়ে পায়ে এসে পাশে দাঁড়ালাম।

—'এতক্ষণ এসে বসেছেন যে?' যেন কত পরিচিতা।

—'এ জায়গাটা একটু নিরিবিলি।' নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল।

ওর পাশে বসে পড়লাম একটা অঙ্ক নিয়ে দেখছি খুবই ব্যস্ত, বার দু' তিন কষেছে। অঙ্ক দেখে আগ্রহ বেড়ে গেল। খাতার উপর নজর দিলাম।

—'এটা কি করছেন এখানে?' ভুল নজরে পড়ল।

—'তবে কি হবে।' সলাজ দৃষ্টিতে তাকাল।

খাতা নিয়ে অঙ্কটা আমিই করে দিলাম—'দেখুন ঠিক হয়েছে কি না?'

অঙ্কটা দেখে মৃদু হেসে বলল—'বাঃ! অঙ্কে আপনার খুব মাথা দেখছি!'

—'একটু মনযোগ দিয়ে করলে আপনিও পারতেন।' প্রশংসা বেড়ে ফেললাম।

এরপর প্রতিদিন সেই রাধাচূড়া গাছের তলায়, টিফিনের সময় ও আসত আর ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে যেতাম আমি। প্রতিদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল পাঠ্য-সংক্রান্ত, হয় অঙ্ক নয় ইংরাজী অথবা অন্য কোন বিষয়। ইতাবসরে কবে থেকে আমি 'তুমিতে' প্রবেশ করলাম জানিনা। কিন্তু কোন দিনই ও 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' নামল না।

প্রায় মাস খানেক এভাবে কাটিয়ে আবার এসেছি আমরা দু'জনে। একটা অঙ্ক গত দিন থেকে কিছুতেই মিলছে না। সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। হঠাৎ ও বলে উঠল—'পেয়ে গেছি!'

উৎসুক হয়ে বললাম—'কোথায়?'

—'এই ফর্মুলাটা ভুল লিখেছেন। ঠিক করে করুন, মনে হয় মিলে যাবে।'

সত্যি মিলে গেল ঐ ফর্মুলা বসাবার পর। ওর দিকে ফিরে বললাম—'এবারও অস্বীকার করবে তোমার অঙ্কে মাথা নেই?'

—'বারে, আপনি তো সব করলেন, আমি শুধু ফর্মুলা ঠিক করলাম।'

—'সেটাইতো আসল, দাও আমার খাতাটা অঙ্কটা করে ফেলি।'

—'উহুঁ, আপনি একবার করেছেন আমার খাতায়, এবার আমি করি এই খাতায়।' বলেই কলম খুলে লিখতে উদ্যোগী হ'ল।

আমিও সেই মুহূর্তে ডান হাত দিয়ে ধরে ফেললাম ওর কলমসহ হাতটা। কিছু একটা বলার আগেই অনুভব করলাম—একটা নরম ফুল আমার হাতের মুঠোয়। ভাষা তখন ঠোঁটের কাছে এসে আটকে গেছে। হাতটা যতই মুক্ত করার চেষ্টা করছি ততই যেন আটকে যাচ্ছে নরম পাপড়ির উপর। চমক ভাঙল ওর কথায়—'কালি লেগে গেল তো হাতে!'

নরম ফুলটাকে মুক্তি দিয়ে হাতের কালিটুকু মাথায় মুছলাম।

আপনারা হয়তো ভাবছেন এরকম একটা নিছক নীরস প্রেম-কাহিনী শোনাবার জন্য এত কিছুর কি প্রয়োজন ছিল? আমিও চেষ্টা করলে হয়তো রসাল করতে পারতাম, তবে তাতে সত্যটুকুই বাদ পড়ে যেত। আর এটা ঠিক প্রেম কাহিনী নয়, কারণ তখনও প্রেম বোধ জাগেনি মনে। যা কিছু করতাম সব যেন ভাল-লাগার খাতিরে। ওকে ভাল লাগত, তাই মিশতাম। ভাল লাগত ওর সান্নিধ্য, তাই পাশে বসতাম। যেমন ভাল লাগে দূর আকাশে কালো মেঘের কোলে সাদা বকের সারি উড়ে যাওয়া দেখতে অথবা সবুজ ঘাসের ডগায় শিশিরের উপর প্রতিফলিত হওয়া সকালের সোনালী রৌদ্রের রামধনু রঙ। আর ওর সব কিছু ভাল লাগত বলেই এত প্রচেষ্টা ওর অন্তরঙ্গ হওয়ার।

শুধু ভাই নয় স্কুল বা কলেজ বন্ধ থাকলেও আমরা এসে বসতাম বই খাতা নিয়ে ঐ রাধাচূড়া গাছের তলায়। সেদিনও এসে বসেছি। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ আমি বললাম—'আচ্ছা তুমি বলতে তোমার খুব সঙ্কোচ?'

কাজল টানা চোখ তুলে উত্তর দিল—'কই না তো।'

—'তবে আমায় আপনি বল কেন?'

চোখ দুটো নাবিয়ে বলল—'এমনি।'

—'এমনি নয়। এরপর থেকে 'তুমি' করেই বলবে।' বোঝাতে চাইলাম 'তুমি' টাই আমার ভাল লাগে।

ঠিক তারপরেই ও বলল—'আজ কি করবেন বলুন?'

—'আমায় বলবে?'

—'তাছাড়া এখানে সোনার মত আর কে আছে।'

—'তবে উত্তর দেব না।'

—'কেন?' বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকাল আমার দিকে।

—'তুমি করেতো বলনি?'

—'বাব্বাঃ! এসে দেখছি ধনুক ভাঙ্গা পণ। আচ্ছা এবার বল কি করা যায়?' মধুর সুরে কথা বলল।

আমি উত্তর দিলাম এবার—'আজ আর কিছু ভাল লাগছে না, গল্প গুজব করে কাটাই।'

এইভাবে চলছিল দিনগুলো। ক্রমশঃ প্রিটেষ্ট পরীক্ষা এগিয়ে এল। দু'জনেই পড়ার মধ্যে ডুবে রইলাম কিছু দিনের জন্য। ভুলে যেতে হল রাধাচূড়া গাছের তলার কথা।

পরীক্ষার ক'দিন আগে পিসতুতো দাদা বলল—'কিরে ডুবে ডুবে কতদিন ধরে জল খাচ্ছিস্?' বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম। দাদা আবার বলল—'কলেজে ঢুকেছিস্ ভাল কথা, তবে ক্লাশ কামাই করিস্ কেন?'

—'ক্লাশ কামাই। কই নাতো?'

—'তবে কি রবীনবাবু মিথ্যা কথা বলেছে? শুনলাম তোর ইংরেজী ক্লাশে পারসেন্টেজ কমে গেছে।'

মিথ্যা কথা বলেননি আমাদের হেডক্লার্ক রবীনবাবু। দুপুরের দেড়টা থেকে সোয়া দু'টোর ক্লাশে রোজই অনুপস্থিত থেকেছি। তার মধ্যে বেশীর ভাগ দিনই ছিল ইংরাজী ক্লাশ। তবুও ভাবলাম আর কিছু বলেননি রবীনবাবু—অবশ্য তেমন কিছু বললে দাদা ঠিকই জানাত। বাড়ীর সবাই এবার জেনে গেল কলেজে পড়ছি।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল—ফলও বেরুল। সব বিষয়ে সাধারণ ভাবে পাশ করেছি তবে ইংরাজী একেবারেই কোনরকমে; ফেলের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি বলা চলে।

আবার শুরু হ'ল কলেজ। আবার সেই রাধাচূড়া গাছ, আবার ওর সান্নিধ্য—ওর কাছ থেকে শুনলাম ও পাশ করে গেছে আর অঙ্কে ভাল নম্বর পেয়েছে। আমিও জানালাম আমার পাশের সংবাদ। তবে ইংরাজীতে ভাল নম্বর পাইনি তা জানালাম না।

দিন সাতেক কেটে গেছে কলেজ খোলার পর। রবীনবাবু ডেকে পাঠালেন—'তুমি দেখছি ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারবে না। ইংরেজীতে তোমার পারসেন্টেজ কম হয়ে যাচ্ছে। কি কর তুমি ঐ সময়?'

রবীনবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি দাদার বন্ধু বলে, আর উনিও আমায় স্নেহ করেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম—'এখন কলেজের মাঠে ক্রিকেট নেমেছে খেলতে গিয়ে ক্লাশ অফ হয়ে যায়।'

—'তার আগে কি করতে?'

কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। একটা উত্তর অবশ্য দেওয়া যায় যেদিন প্রথম ক্লাশ

শুরু হয় দেড়টায় সেদিন আসতে দেরী হয়ে যায়। তার আগেই তিনি বললেন—'এবার থেকে খেলো ছেড়ে প্রতিদিন ক্লাশ কর, তবে পরীক্ষায় বসতে পারবে।'

পরের দিনও গেলাম সেই গাছ তলায়, আজ ওকে বলে দেব আর আসতে পারব না ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে, রোজ ক্লাশ করতে হবে। কিন্তু বলব কাকে ও তো নেই, চুপ করে বসে রইলাম।

কোথা থেকে একটা কাঠ বিড়ালী ছুটে এসে দাঁড়াল গাছের গোড়ায়। এদিকে সেদিক তাকিয়ে কি খুঁজল যেন? তারপর দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল। আমার মতই হয়তো কোন ভাল-লাগা বস্তুর অপেক্ষায় রইল কিছুক্ষণ। একটা মৃদু শব্দ হতেই চকিতে পালিয়ে গেল। শব্দের উৎসে চোখ ঘোরালাম। কিছুই না—একটা শালিক শুকনো পাতার উপর লাফাচ্ছে। তখনও পর্য্যন্ত এল না সে, আস্তে আস্তে উঠে ফুলের পথ দিয়ে চলতে শুরু করলাম কলেজের দিকে। আশে পাশে তাকিয়েও নিরাশ হতে হ'ল।

কলেজে এসে দেখি ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে। ক্লাশে ঢুকলাম, তবে মন পড়ে রইল সেই গাছ তলায়।

শুধু সেই দিনই নয় প্রায় দিন চারেক তার দেখা পেলাম না। পরের দিনও নিরাশ হয়ে উঠবার উদ্যম করছি—সেই সময় ও এসে পড়ল। বই-পত্রগুলো রেখে পাশে বসল। কেন জানি না তখনই সেই কথাটা উত্থাপন করতে পারলাম না। বরং প্রখর দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম ওকে, কোন অসুস্থতার লক্ষণ আছে কি না?

—'কি দেখছ অমন করে?'

—'দেখছি তোমার অনুপস্থিতির কারণ। অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—'না তেমন কিছুই হয়নি।' উত্তর দিয়েই ইংরাজী বইটা খুলল।

আজকের ক্লাস যখন অফ্ই গেল তখন বাকী সময়টাও এখানে কাটিয়ে যাই, আর সোয়া দু'টোর পর তো কোন ক্লাস নেই। ওকে বললাম—'আজ টিফিনের পর নাই বা গেলে ক্লাসে?'

সম্মতি জানিয়ে বলল—'তা না হয় হ'ল, কিন্তু করবে কি এখন?'

—'এতদিন পর এসেছে পড়াশুনা আজ বন্ধ থাক্। তার চেয়ে গল্পই করি।' বলেই ভাবলাম যাওয়ার সময় বলব সে কথাটা।

যদিও গল্প শুরু করলাম তবে তার বেশীর ভাগই হ'ল পড়াশুনা সংক্রান্ত। একটু আধটু রসিকতাও হয়েছিল মাঝে মাঝে। যখন হাওয়ায় রাধাচূড়া ফুলগুলো ঝরে পড়ছিল ঘাসের উপর—কোথা থেকে তখন একটা ফুল উড়ে এসে পড়ল ওর খোঁপায়। আমি সরসে বললাম—'বাঃ! ফুলও জানে দেখছি কোথায় পড়লে ওকে বেশী মানাবে!'

খোঁপা থেকে ফুলটা তুলে আমার বুকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—'হিসেবে একটু ভুল করেছিল ফুলটা। এবারই সবচেয়ে বেশী মানিয়েছে।' দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

ওদিকে কখন যে মুহূর্ত গড়িয়ে মিনিট, মিনিট থেকে ঘণ্টা এবং ঘণ্টা টপ্‌কে দিনটাও পার হতে চলল খেয়াল করিনি। সূর্য যখন দিনান্তের ক্লান্তিতে ঢলে পড়েছে পশ্চিমে ; পাখীরা যখন নীড়াভিমুখী, সূর্যের শেষ ছটায় যখন পৃথিবী রঙ্গিন হয়ে উঠেছে—দু'জনে তখন উঠলাম ভাল-লাগা মুহূর্তগুলো কাটিয়ে।

হাত ধরাধরি করে মাঠ পার হতে হতে বললাম—'প্রতিদিন বোধহয় আর আসা হবে না রাধাচূড়ার তলায়, আমার ইংরেজী ক্লাশ থাকে ঐ সময়। এতদিন অফ্‌ করেই এসেছি বলে পারসেন্টেজ কমে গেছে।'

বিষণ্ণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'আমার যে কিছু অঙ্ক বোঝার বাকী ছিল।'

—'একেবারেই আসব না তা নয়, সুযোগ পেলেই আসব ক্লাশ বাঁচিয়ে।' আমি আশ্বাস দিলাম।

তারপরেও গিয়েছি মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে যা না পেলেও। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত ঐ সময় চার দেওয়ালে আবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বসে থাকতে। কিন্তু নিরুপায়, এক রকম বাধ্য হয়েই থাকতে হতো।

এত করেও পারসেন্টেজে কমি হলাম। শেষে রবীনবাবুকে ধরে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করলাম।

ক্রমশঃ দিনগুলো পার হয়ে ওর টেস্ট-পরীক্ষা, আমার টেস্ট-পরীক্ষা এবং যথা সময়ে ওর ফাইন্যাল পরীক্ষা সবই হয়ে গেল, এখন বাকী আমার ফাইন্যাল।

ইতিমধ্যে একদিন দিদি ধরল ইংরাজী বইটা কতদূর শিখেছি পরখ করার জন্য। যদিও কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছি কিন্তু প্রায় লেখকের নাম অন্যের সাথে গুলিয়ে ফেলেছি। দিদি অভিযোগ করল—'প্রি-টেস্ট কোনরকমে টেস্ট পরীক্ষাও না হয় ধরে বেঁধে টপ্‌কে গেছিস্‌। একে ইংরেজীতে কাঁচা, আর এভাবে পড়লে তুই ইংরেজীতে অবধারিত ফেল্‌।'

আমি উঠে পড়ে লাগলাম পাশ করতেই হবে। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে ইংরাজীতে মনযোগ দিলাম বেশী। যথা সময়ে ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেল।

অবসর মুহূর্তগুলো এখন আর কাটতে চায় না। মাঝে-মাঝে সাইকেল নিয়ে যাই সেই মাঠের পাশে—বাগানে। সবই আছে আগের মত। রাধাচূড়া গাছ, আশেপাশের কোলাহল, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে, কাঠবিড়ালীর ছুটোছুটি, শালিকের লাফালাফি। কিন্তু এত থাকার মধ্যেও নেই সেই ভাল-লাগা মুখখানি, সেই ভাল-লাগা হৃদয়টুকু—অভাব সেই ভাল-লাগা সান্নিধ্যের। তাই ভাল-লাগা স্মৃতিগুলোকেই রোমন্থন করে সময় কাটাতাম। একসময় শুনলাম উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। খুব উৎসুক হয়ে উঠলাম ওর খবরের জন্য। যদিও সাক্ষাৎ ভিন্ন জানার অন্য কোন উপায় আবিষ্কার করতে পারলাম না। অন্ততঃ কলেজে ভর্তির লিস্ট না টানানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মনে মনে ছবি আঁকলাম—দু'জনে পাশ করলে এবার থেকে একই ক্লাশে, ভাল-লাগার

পাশাপাশি। আর ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে রোজ রাধাচূড়া তলে দৌড়তে হবে না ; দীর্ঘ অদর্শনের দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে হবে না।

ক্রমে ক্রমে আমার ফল বেরুবার দিন এগিয়ে এল, দিন গুনছি সেই চরম মুহূর্তের জন্য। হঠাৎ এক সকালে পিসতুতো দাদা জানাল—'কিরে, তুই ঘরে বসে ? রবীনবাবুর বাড়ী যা—শুনলাম গতকাল নাকি কলকাতায় গেজেট বেরিয়েছে ?'

—'রবীনবাবু কি করবে ?' আমি প্রশ্ন রাখলাম।

—'সে আজ সকালে কলকাতা থেকে ফিরছে, আমি বলে রেখেছিলাম তোর রেজাল্ট জেনে নিতে।'

দাদার ঠিকানানুযায়ী রবীনবাবুর বাড়ীর সন্ধানে বেরুলাম। রায়পাড়া বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে ঢুকতে হ'ল রায় পাড়ার পথে, আশে পাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলছিলাম—যদি হঠাৎ ভাল-লাগার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুমান করলাম এখান থেকেই যখন বাসে ওঠে তখন এখানে থাকা স্বাভাবিক।

নির্দিষ্ট বাড়ীর কাছে এসে দরজার কড়া নাড়াতে নাড়াতে দৃষ্টিকে আর একবার প্রসারিত করলাম চারপাশে ; যদি ক্ষণিকের জন্যও ভেসে ওঠে সেই মুখ কোন দরজা, জানালা বা ছাদের ফাঁকে।

খুট করে দরজা খুলে যেতে একগাদা বিস্ময় এসে আঘাত করল—'একি তুমি !'

—'আশা করনি তো।' সেই ভাল-লাগা মুখে হাসির জোয়ার তুলে উত্তর দিল।

আমিও হেসে বললাম—'অবশ্য নিরাশ হইনি। তারপর পরীক্ষার খবর বল ?'

শাড়ীর আঁচল বুকের উপর দিয়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বলল—'দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছি। অঙ্কে ভাল নম্বরই পেয়েছি তোমার প্রচেষ্টায়। এবার তোমারটা শোনাও।'

—'আমারটা শোনার জন্য এখানে এসেছি।'

—'ও দাদার কাছে এসেছ ?' ভেতরে এস।

সাইকেল বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলাম—'রবীনবাবু তোমার আপন দাদা ?'

—'ওমা, তুমি জানতে না !' বিস্ময় প্রকাশ করল।

—'এইমাত্র জানলাম।'

রবীনবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন—'পরীক্ষা কি রকম দিয়েছিলে ?'

—'সেটা জানার জন্য দাদা আপনার কাছে পাঠালেন।'

—'তোমার দ্বারা জীবনে কিছুই হবে না। ক্লাশ করবে না ঠিকমত—দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেও আটকে গেলে একটুর জন্য। কম্পার্টমেণ্টাল পেয়েছ ইংরেজীতে···' গেজেট এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

আর কিছু শোনার মত ধৈর্য্য ছিল না। চোখ ফেটে তখন জল আসছে—দুঃখে, অপমানে, লজ্জায়।

একছুটে বাইরে এসে সাইকেল চড়ে পালিয়ে এলাম। শুধু মনে আছে, আমার শয়ন ও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বিষণ্ণ ভাবে। খুসী মাখানো চোখ দু'টো ওর বোধহয় আমার জন্যই করুণ হয়ে উঠেছিল সেদিন।

এরপর আর পারিনি সেই ভাল-লাগা নেশায় মাততে। কোথা থেকে যেন একটা লজ্জা এসে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছিল।

আমার এতদিনের 'ভাল-লাগা'র মৃত্যু ঘটল সেই দিনই।

মনকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু সেই লজ্জা আর সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে মৃত 'ভাল-লাগা'কে আবার বাঁচাবার জন্য কিছুতেই পারলাম না বেহলা হ'তে।